জুলাই ২০২২ ■ আষাঢ়- শ্রাবণ ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

আদিবা হোসেন, ৯ম শ্রেণি, শেরপুর গালর্স হাইস্কুল, নকলা, শেরপুর

ঐশী দফদার, ৮ম শ্রেণি, রংপুর কালীতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডুমুরিয়া, খুলনা

সম্পাদকীয়

প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আমরা ছেলেবেলায় মা-বাবা অথবা দাদি-নানুর কোলে শুয়ে ছড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পরেছি। কখনো বা বায়না ভুলেছি ছড়া শুনে। সেসব ছড়া তোমরা কি জানো? আবার কিছু ছড়া হয়ত অনেক আগে পাঠ্যবইয়ে ছিল, তোমরা পড়োনি। হারিয়ে যাওয়া এসব ছড়াগুলো সুরে সুরে পড়তে দেখো কেমন মজা লাগে? পড়া হয়ে গেলে মতামত জানিও কিন্তু।

আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। বর্ষায় সবুজে শ্যামলে প্রকৃতি হয়ে উঠে মোহনীয়। বাংলার কবিরা বর্ষাকে নিয়ে লিখেছেন অসংখ্য, কবিতা, গান, গীতি আলেখ্য। বর্ষা সকলের অনেক প্রিয় ঋতু হলেও এ সময়ে থাকতে হবে সচেতন। কারণ এ সময় ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগ থেকে যেন সুরক্ষিত থাকি, সে দিকে নজর রাখতে হবে। এছাড়া একা একা পুকুর কিংবা জলাশয়ে নামবে না। বর্ষায় চারিদিকে থৈ থৈ পানি, এ সময়ে সাপেরা গাছের গর্তে বা ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নেয়। তাই সাপে কাটা থেকে রক্ষা পেতে চলাফেরায় সাবধান হবে।

বন্ধুরা, ২৫শে জুন আমাদের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন, দেশের সকল মানুষকে আনন্দে উদ্বেলিত করে। তোমরাও নিশ্চয়ই খুব খুশি, তাই না ছোট্ট বন্ধুরা?। এই সেতু আমাদের আনন্দ ও গর্বের বিষয়। শুভ উদ্‌বোধনের জন্য নবারুণের বন্ধুদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানাই অভিনন্দন ।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

সূচিপত্র

নিবন্ধ

ফুলের বন্ধু বঙ্গবন্ধু/অনুপম হায়াৎ ১২
ভালোবাসার পদ্মা সেতু/আরিফুর রহমান ১৯
আষাঢ়ের রূপবৈচিত্র্য/শেখ একেএম জাকারিয়া ২২
বৃষ্টি নেই যেখানে/আবু রোহান আহমেদ ২৫
পানিতে ডুবা প্রতিরোধে করণীয়/আবদুল খালেক খান ৪৯

গল্প

স্বপ্নের পদ্মা সেতু/জসীম আল ফাহিম ১৪
পদের শ্রেণিবিভাগ/তারিক মনজুর ২৬
কাগজের ছাতা/মেহেরুন ইসলাম ২৮
আবিরের গাছবন্ধু/মাসুদ রানা আশিক ৩১
তারার বৃষ্টি/মুহসীন মোসাদ্দেক ৪৭

কবিতা ও ছড়া

চিরায়ত ছড়া ০৩
আবদুল লতিফ/সোহানা আকতার/মুস্তফা হাবীব ১৮
প্রসেনজিৎ কুমার দে ২১
পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী/সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম/ফারুক নওয়াজ ২৪
খোরশেদ আলম নয়ন/আলম শামস/রাকিব আজিজ ৩৩

সাফল্য প্রতিবেদন

৪৩ বিশ্ব বাঘ দিবস/শাহানা আফরোজ
৪৫ নতুন এক ফুলের কথা/মো. ইকবাল হোসেন
৫২ সাপে কাটায় দ্রুত কিছু পদক্ষেপ/মো. জামাল উদ্দিন
৫৩ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশ করল বাংলাদেশ/মেজবাউল হক
৫৪ বিতর্কের বিশ্বকাপ জিতল বাংলাদেশ/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৫ পাঁচ বছর বয়সে বিশ্ব রেকর্ড/জান্নাতে রোজী
৫৬ যে গাছ হেঁটে বেড়ায়/আব্দুল্লাহ আল মামুন
৫৮ দুই বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা/ সুলতানা বেগম
৫৯ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

৩৪ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আদিবা হোসেন, ঐশী দফদার
৩৯ আদ্রিতা খানম নিহাল
৪৬ মো. আব্দুল্লাহ
৫১ সুস্মিতা শীল
৫৭ সাথী নূর নাজিম, মো. হিমেল
৬৩ ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন, আয়ান হক ভূঁইয়া
৬৪ রাইসা ইন্তেসার ইমরান, সৈয়দ ফারহান নেয়ামুল জীম

ছোটোদের ছড়া ও গল্প

৪০ লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা/আরিবা ইবনাত
মাহির আহমেদ/শাহনেওয়াজ বাপ্পী
৪১ বুলবুলি ও দুটো ছানা/ রকিয়া জান্নাত রুমা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

চিরায়ত ছড়া

ছড়া মুখে মুখে উচ্চারিত ঝংকারময় ছন্দে রচিত কিছু শব্দ। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন শাখা। যার রয়েছে কমপক্ষে দেড় হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাস। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ছড়ার বিকাশ আমাদের বার বার চোখে পড়েছে। আদিতে সাহিত্য রচিত হতো মুখে মুখে এবং ছড়াই ছিল সাহিত্যের প্রথম শাখা বা সৃষ্টি। সাহিত্য লিখিত রূপ পাওয়ার পূর্বে লোকসমাজে ছড়াই ছিল ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম। তাই কেউ কেউ ছড়াকে লৌকিক সাহিত্য বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ছড়া শিশুদের খেলামেলার কাব্য। ছেলেবেলার ছড়াগুলো যা আমরা শুনেছি, আমাদের বাবা-মায়েরা শুনেছে, তাদের বা-মায়েরাও শুনেছেন। আবার তোমরাও শুনেছ এভাবেই চলে আসছে। মুখে মুখে প্রচলিত নানা কাহিনি, লোক গাথা, প্রবাদ প্রবচনগুলোই আমাদের সকলের ছেলেবেলা ছড়া হয়ে ঘুরে ফিরছে যুগের পর যুগ। মূলত এগুলো মুখে মুখে তৈরি হয়ে সাহিত্যে তার জায়গা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। কবে কীভাবে কার মুখে এগুলো তৈরি হয়েছিল তার হদিস আজো পাওয়া যায়নি। তবে এ ছড়াগুলোতে আছে ভাবের সহজ-সরল প্রকাশ। শিশুদের মন ভোলানোর জন্য মনের আনন্দে তালে আর সুরের সমন্বয়ে ছড়াগুলো পেয়েছে অনবদ্য রূপ। যা প্রতিটি শিশুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কল্পনার জগতে। আনন্দের উৎস হয়ে মনের গভীরে বেঁচে থাকে চিরকাল। এগুলো শুধু ছড়া নয়, আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতি, সামাজিক পরিবেশ, প্রকৃতির ছন্দময় ভাষা যা হয়ত আমরা শুনেছি দাদি-নানি বা মায়ের কোলে শুয়ে। হয়ত কখনো ঘুম ঘুম চোখে কখনো আবদার ভোলানোর জন্য, কখনো খেলা বা সময় কাটানোর অনুষঙ্গ হিসেবে। জন্মের পর থেকে ছড়া শুনতে শুনতে বড়ো হই। শিক্ষাজীবনও শুরু করেছি ছড়া দিয়ে। যা আজো মনে গভীরে দাগ কেটে আছে। নবারুণ এ সংখ্যায় মনের অনাবিল আনন্দ নিয়ে কিছু চিরায়ত আর ছেলেবেলার মজার কিছু ছড়া তোমাদের উপহার দিচ্ছে। চলো সবাই সুর করে ছড়াগুলো বলি আর কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভেসে বেড়াই সাদা-কালো কল্পনার জগতে।

ক্রিং ক্রিং টেলিফোন

ক্রিং ক্রিং টেলিফোন
হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!
কে– তুমি, কাকে চাই?
বলো বলো বলো।

আমি ম্যাও, হুলো– ক্যাট,
ইঁদুরকে চাই–
জরুরী আলাপ আছে
তুমি কে হে ভাই?

আমিই ইঁদুর, তবে
কথা হলো এই–
আমি গেছি মার্কেটে
বাড়ীতেই নেই।

ক্রিং ক্রিং টেলিফোন–
শোনো হে ইঁদুর!
শুনবো না শুনবো না
দূর, দূর, দূর !!!

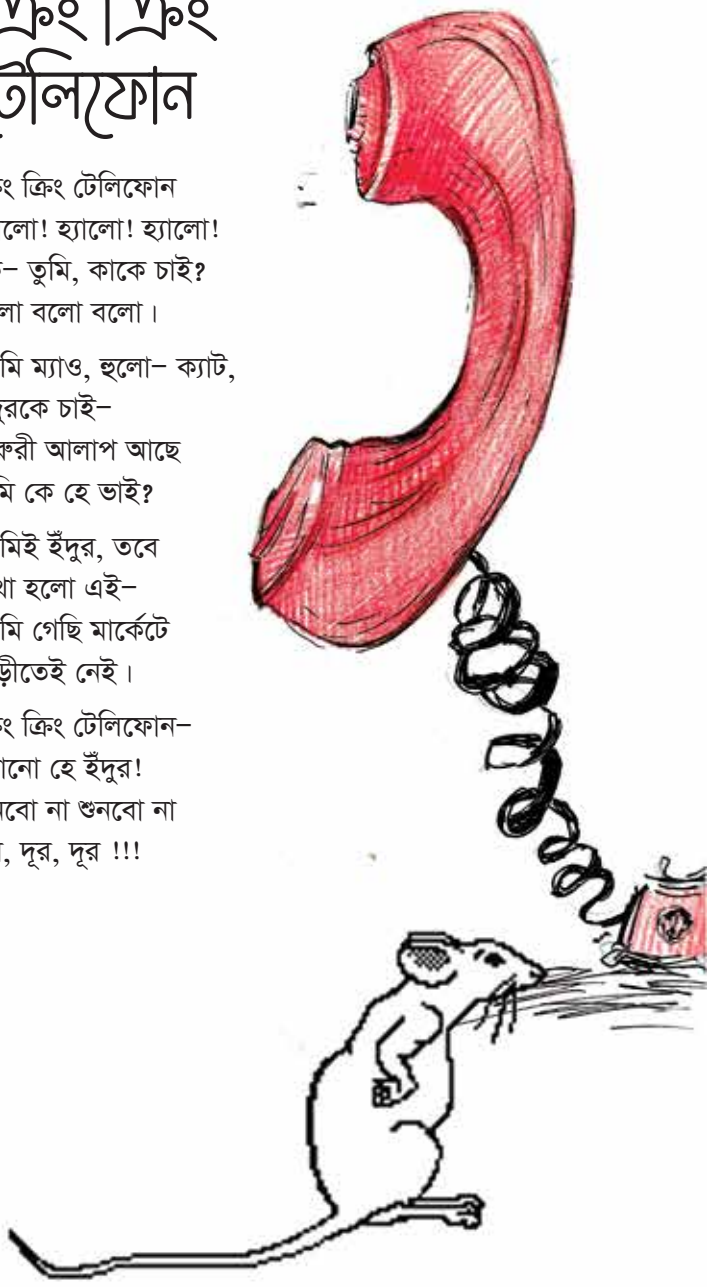

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদে এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল
তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন
এক কন্যা খান,
এক কন্যা রাগ করে
বাপের বাড়ি যান।

তাই তাই তাই

তাই তাই তাই
মামার বাড়ি যাই,
মামার বাড়ি ভারি মজা
কিল চড় নাই।

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা

তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা
কোলা ব্যাঙের ছা।
খায় দায় গান গায়
তাই রে-নাই রে না।

আয় আয় চাঁদ মামা

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
মাছ কাটলে মুড়ো দেব
কাল গাইয়ের দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

সিংহ মামা

সিংহ মামা সিংহ মামা
করছো তুমি কি,
এই দেখ না কেমন
তোমার ছবি এঁকেছি...!!!

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কিসে।
ধান ফুরালো, পান ফুরালো,
খাজনার উপায় কী
আর ক'টা দিন সবুর কর,
রসুন বুনেছি।

নোটন নোটন পায়রাগুলি

নোটন নোটন পায়রাগুলি
ঝোটন বেঁধেছে,
ওপারেতে ছেলেমেয়ে
নাইতে নেমেছে।
দুই ধারে দুই রুই কাতলা
ভেসে উঠেছে,
কে দেখেছে কে দেখেছে
দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল
ছুঁড়ে মেরেছে,
উঃ বড্ড লেগেছে।

আয়রে আয় টিয়ে

আয়রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে,
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে,
কদম তলায় কে?
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে,
সোনামনির বে।

হাট্টিমাটিম

রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই)

টাট্টুকে আজ আনতে দিলাম
বাজার থেকে শিম
মনের ভুলে আনল কিনে
মস্ত একটা ডিম।

বলল এটা ফ্রি পেয়েছে
নেয়নি কোনো দাম
ফুটলে বাঘের ছা বেরোবে
করবে ঘরের কাম।

সন্ধ্যা সকাল যখন দেখো
দিচ্ছে ডিমে তা
ডিম ফুটে আজ বের হয়েছে
লম্বা দুটো পা।

উল্টে দিয়ে পানির কলস
উল্টে দিয়ে হাঁড়ি
আজব দু'পা বেড়ায় ঘুরে
গাঁয়ের যত বাড়ি।

সপ্তা বাদে ডিমের থেকে
বের হলো দুই হাত
কুপি জ্বালায় দিনের শেষে
যখন নামে রাত।

উঠোন ঝাড়ে বাসন মাজে
করে ঘরের কাম
দেখলে সবাই রেগে মরে
বলে এবার থাম।

চোখ না থাকায় এ দুর্গতি
ডিমের কি দোষ ভাই
উঠোন ঝেড়ে ময়লা ধুলায়
ঘর করে বোঝাই।

বাসন মেজে সামলে রাখে
ময়লা ফেলার ভাঁড়ে
কাণ্ড দেখে টাট্টু বাড়ি
নিজের মাথায় মারে।

শিঙের দেখা মিলল ডিমে
মাস খানিকের মাঝে
কেমনতর ডিম তা নিয়ে
বসলো বিচার সাঁঝে।

গাঁয়ের মোড়ল পান চিবিয়ে
বলল বিচার শেষ
এই গাঁয়ে ডিম আর রবে না
তবেই হবে বেশ।

মনের দুখে ঘর ছেড়ে ডিম
চলল একা হেঁটে
গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে
ডিম গেলো হায় ফেটে।

গাঁয়ের মানুষ একসাথে সব;
সবাই ভয়ে হিম
ডিম ফেটে যা বের হলো তা
হাট্টিমাটিম টিম।

হাট্টিমাটিম টিম
তারা মাঠে পারে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমাটিম টিম।

বাক বাকুম পায়রা

রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই)

বাক্ বাক্ কুম পায়রা
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল কি?
চড়বে সোনার পালকি?
পালকি চলে ভিন গাঁ-
ছয় বেহারার তিন পা।
পায়রা ডাকে বাকুম বাক্
তিন বেহারার মাথায় টাক।
বাক্ বাকুম কুম্ বাক্ বাকুম
ছয় বেহারার নামলো ঘুম।
থামলো তাদের হুকুম হাঁক
পায়রা ডাকে বাকুম্ বাক্।
ছয় বেহারা হুমড়ি খায়
পায়রা উড়ে কোথায় যায়?

খোকা গেছে মাছ ধরতে

খোকা গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে
মাছ নিয়ে গেল চিলে।

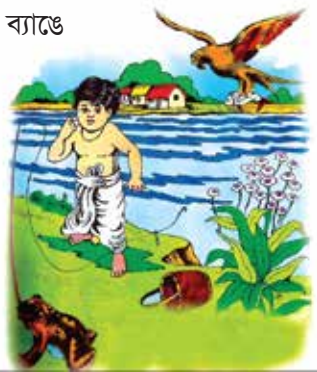

কেঁদো বাঘ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
গাঁ-গাঁ করে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।

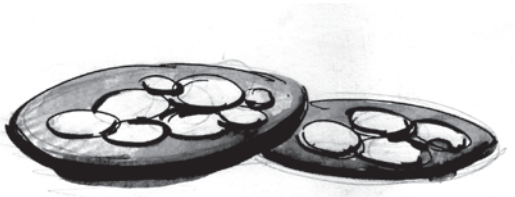

ঝালের পিঠা

আল মাহমুদ

ঝালের পিঠা, ঝালের পিঠা
কে রেঁধেছে কে?
এক কামড়ে একটুখানি
আমায় এনে দে।

কোথায় পাবো লঙ্কাবাটা
কোথায় আতপ চাল
কর্ণফুলীর ব্যাঙ ডাকছে
হাঁড়িতে আজকাল।

জুতো

শামসুর রাহমান

একটা লোকের উঠোন জোড়া
জুতোর বহর মস্ত।
জুতোর ভেতর লোকটা জানি
উঠতো এবং বসতো।
ঘরহারা কেউ ঝড়ের পরে
ধরলে ঘরের বায়না,
লোকটা তখন বলতো ডেকে,
জুতোর ভেতর আয়না।।

মেজাজ

ফয়েজ আহ্‌মদ

মেজাজ ছিল তিরিক্ষি তার
মাথায় ছিল চুলের বাহার।
শুনতে পেলাম তার সে চুলে
কোত্থেকে এক চড়ুই ভুলে
মনের সুখে বানিয়ে বাসা
কাটাচ্ছে দিন–বেস তো খাসা।

হাঁটি হাঁটি পা পা

এখলাসউদ্দিন আহমদ

এক পা যেতে
তিন পা টলে
দুই পা যেতে
ঝুপ।
তিন পা যেতে
এক পা টলে
পাঁচ পা যেতেই
চুপ !
ছয় পা যেতে
আর টলে না
কেবল হাঁটা
হাঁটি !
তেলের শিশি
উল্‌টে ফেলে
ঘর সংসার
মাটি।
হাঁটি হাঁটি পা পা
যেখান খুশী সেখান যা ॥

হন্ হন্ বন্ বন্

সুকুমার রায়

চলে হন্ হন্ ছোটে পন্ পন্
ঘোরে বন্ বন্ কাজে ঠন্ ঠন্
বায়ু শন্ শন্ শীতে কন্ কন্
কাশি খন্ খন্ ফোঁড়া টন্ টন্
মাছি ভন্ ভন্ থালা ঝন্ ঝন্

জোনাকি

কাজী আবুল কাসেম

জোনাকি জোনাকি ।
হাতে যায় গোনা কি?
ঘুটঘুটি আঁধারে,
বনে আর বাদাড়ে।
আলো জ্বেলে তোরা কি?
খুঁজে পাস সোনা কি?
জোনাকি, জোনাকি।

ফুল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল ছিল ডাল খালি
আজ ফুলে গেছে ভরে।
বল দেখি, তুই মালী,
হয় সে কেমন করে।
গাছের ভিতর থেকে
করে ওরা যাওয়া আসা।
কোথা থাকে মুখ ঢেকে,
কোথা যে ওদের বাসা।

(সংক্ষিপ্ত)

খুকুর ছড়া

জসীম উদদীন

সমুদ্দুরে বালুর চরা
রতন মানিক ঝিনুক ভরা,
ঝিনুক তো নয় ঝিকিমিকি
খুকু করে কিনি- বিকি
ফিরে আসবে ঘরে
ঘর ঝলমল করে।

ইলিশ

ফররুখ আহমদ

ইলিশ খোঁজে ইলশেগুঁড়ি,
বিষ্টি ঝরে মুড়কি মুড়ি ;
পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে,
জেলে ডিঙির জাল ডিঙিয়ে,
ইলিশগুলো লেজ উঁচিয়ে,
মনের সুখে যায় উজিয়ে ঃ
গোয়ালন্দ ঘাটে এসে
ইলিশ ধরা পড়ে শেষে।

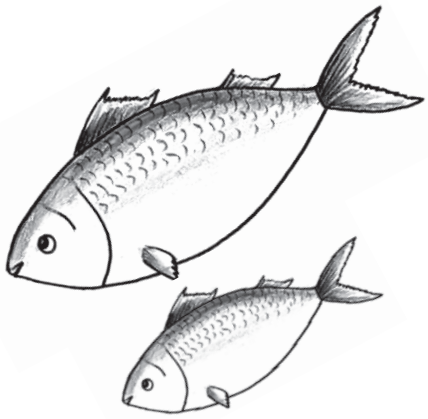

ছড়া

সুফিয়া কামাল

ইতল বিতল গাছের পাতা
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা।
বিষ্টি পড়ে ভাঙে ছাতা
ডোবায় ডোবে ব্যাঙের মাথা।

চিরল চিরল তেঁতুল পাতা
তেঁতুল বড়ো টক,
মিষ্টি রেখে তেঁতুল খেতে
খুকুর বড়ো শখ।

ঘুঘু

আল কামাল আবদুল ওহাব

ঘুঘু ডাকে গাছের ডালে
কুমড়ো ঝোলে ঘরের চালে
ওই ঘুঘুটা মারবো
কুমড়োগুলো পারবো

পারিস কি তুই

আখতার হোসেন

পারিস কি তুই শীতের ভোরে
দিঘির জলে নামতে
ডুবটি দিয়ে চুপটি করে
আপন মনে ভাবতে
কি বললি, পারবি নে তুই
করতে ওসব কিচ্ছু
কান্না জুড়ি হঠাৎ করে
কামড়ে দিল বিচ্ছু।

বেকার

মাহমুদ উল্লাহ

মামুদ মিঞা বেকার
তাই বলে কি
সাধ নাই তার
বিশ্ব ঘুরে দেখার?
আসলে পরে চেকার
বললে হেসে
মামুদ মিঞা :
ট্রেন কি তোমার একার?

ঘুমিয়ে যা

সুলতানা রাহমান

আউলি বাউলি খাউলি খাঁ
দুপুর রোদ ঝাঁ ঝাঁ
কাকা করে কাকের ছা,
খোকা খুকু ঘুমিয়ে যা।

ফুলের বন্ধু বঙ্গবন্ধু

অনুপম হায়াৎ

জাতির পিতা মহান নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ফুল ভালোবাসতেন, ফুলের বাগান করতেন, ফুলের মালা বানিয়ে অন্যকে উপহার দিতেন। ফুলের মতোই সৌরভে গৌরবে ভরা ছিল তাঁর জীবন।

॥ক॥

ফুল চর্চা ও ফুল প্রীতি সম্পর্কে জানা যায় তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) ও অন্যান্য সূত্রে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর বঙ্গবন্ধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবির প্রতি সমর্থন এবং অন্যান্য কারণে গ্রেফতার হয়ে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা জেলে বন্দি হন। ওই সময় তাঁর সঙ্গে জেলে ছিলেন ছাত্রনেতা শামসুল হক। জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর অভ্যাস ছিল বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বই পড়া এবং ফুলের বাগান করা। শামসুল হক সাহেবের স্ত্রী জেলখানায় আসতেন দেখা করতে। মাঝেমধ্যে তিনি বইও পাঠাতেন বঙ্গবন্ধুকে। তাঁদের দেখার দিন বঙ্গবন্ধু ফুলের মালা বানিয়ে উপহার দিতেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন-

'আমি ফুলের বাগান করতাম। তাদের দেখা হবার দিনে ফুল তুলে হয় ফুলের মালা, না হয় তোড়া বানিয়ে দিতাম' (পৃ:১৬৯)।

বঙ্গবন্ধু অন্য জেলে গিয়েও ফুলের বাগান করার অভ্যাস বজায় রেখে ছিলেন। ঢাকা জেল থেকে বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে গোপালগঞ্জ জেলে এবং পরে ফরিদপুর জেলে রাখা হয়। এটা ১৯৫০ সালের পরের কথা। ফরিদপুর জেলে থাকার সময় বঙ্গবন্ধু বই ও খবরের কাগজ পড়তেন এবং নামাজ পড়তেন ও কোরান তেলাওয়াত করতেন। বাকি সময়টাতে তিনি ফুলের বাগানকে আরো সমৃদ্ধ করার ভার নেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

'হাসপাতালের সামনে সামান্য জায়গা ছিল, একটা ফুলের বাগানও ছিল, তাকে যাতে আরও ভালো করা যায় তার উদ্যোগ নিলাম'। (পৃ:-১৮০)

॥খ॥

ফুল এবং বাগান চর্চা সম্পর্কে আরো অনেক চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' (২০১৭) গ্রন্থে। ১৯৬৬ সালের ৬ই জুন তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন যে, ঐদিন বিকেলে তিনি বাগানের কাজ করেন। তাঁর বাগানে লাউ, ঝিংগার গাছ হয়েছে, ফুলের বাগানটিকে নতুন করে সাজিয়েছেন, তাঁর ছোঁয়া পেয়ে ফুলের গাছগুলো নতুন জীবন পেয়েছে। (পৃ: ৬৮-৬৯)

১১ই জুন তারিখের ডায়েরিতে লিখেছেন: 'ফুলের গাছ চারিদিকে লাগাইয়া দিলাম, নতুন পাতা ছাড়তে শুরু

করেছে। বড়ো চমৎকার লাগছে'। (পৃ:-৮০)

২৩শে জুনের ডায়েরিতে রয়েছে- বৃষ্টির কারণে তাঁর বাগানে দূর্বা ঘাসের সবুজ হওয়া এবং বাতাসের তালে তালে নৃত্য করার কথা।'(পৃ:১১৯)

১৯৬৬ সালের ২৪শে জুন ছিল শুক্রবার। এদিনের ডায়েরিতে বঙ্গবন্ধু জেলখানার ঘরে বসে সকালে চা খেয়ে আকাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লিখেছেন-

'আমার ঘরের কাছে একটা কামিনী ও একটা শেফালি গাছ। কামিনী যখন ফুল দেয় আমার ঘরটা ফুলের গন্ধে গন্ধে ভরে থাকে'। (পৃ:১১৯)

পরদিন ২০শে জুনও লিখেছেন, জেলখানার ফুলের বাগান নিয়ে।

'ডাব খেয়ে পাইপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আবার ফুলের বাগানে একটি মাত্র বন্ধু ফুলের বাগান। ওকে আমি ভালোবাসতে আরম্ভ করেছি।' (পৃ: ১২৩)

জেলখানার ভেতরে থেকেও বঙ্গবন্ধু বাগান পরিচর্যা করতেন, অপ্রয়োজনীয় গাছ, আগাছা ছেঁটে ফেলতেন। নিজে প্রয়োজনীয় গাছ রোপণ করতেন।

১৯৬৬ সালের ৪ঠা আগস্টের ডায়েরিতে পাওয়া যায় অন্যান্য জেলবন্দি কর্তৃক বাগান চর্চার কথাও। এঁদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন বাবু। তিনি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৬২ সালে তৈরি বাগানটির বর্তমান রক্ষক। বঙ্গবন্ধু তখন অন্য সেলে বন্দি। তিনি ধীরেন বাবুকে খবর দেন ওখান থেকে গোলাপের চারা দেওয়ার জন্য। ওই দিনের ডায়েরিতে লিখেছেন বঙ্গবন্ধু :

'আমি খবর দিয়েছিলাম কয়েকটা গোলাপের চারা দিতে। আজ বিকেলে তিনটা লাল গোলাপের চারা পাঠাইয়া দিয়েছেন। আমি লেগে পড়লাম বাগানে, তাড়াতাড়ি গর্ত করে সার দিয়ে লাগাইয়া দিলাম। এত ইটের টুকরো পরিষ্কার করতে জান শেষ হয়ে যায়। আমার বাগানটাও সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেখতে বেশ লাগে। এই তো আমার কাজ। বই পড়া ও বাগান করা।' (পৃ: ১৮৯-১৯০)

১৯৬৭ সালের ১৭ই মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম জন্মদিন। এ দিন জেলখানার বন্দিরা বঙ্গবন্ধুকে গোলাপ ও ডালিয়া ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিন বিকেলে বেগম মুজিব, শেখ রেহানা ও রাসেল ফুলের মালা নিয়ে দেখা করতে যান। (পৃ: ২০৯-২১০)

জেল জীবনে বঙ্গবন্ধুর বাগান করা, ফুলের গাছ লাগানো, বই পড়া, সংবাদপত্র পড়া ছিল আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করা। তিনি লিখেছেন, 'ফুলের বাগান করেছি। জায়গাটা ছাড়তে ইচ্ছে হয় না... সকালবেলা যখন ফুলের বাগানে বেড়াতে শুরু করি তখন রাতের কষ্ট ভুলে যাই।' (পৃ: ২১৮)

১৯৬৭ সালের ১৪-১৫ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষের শুরুতে নূরে আলম সিদ্দিকী, নূরল ইসলাম ও আরো কয়েকজন রাজবন্দি ফুল দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। বঙ্গবন্ধুও অন্যান্য রাজবন্দিকে ফুল পাঠিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। (পৃ:২২২-২২৩)।

॥গ॥

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম জড়িয়ে আছে ফুলের সৌরভের মতো। বেঁচে থাকতে তিনি কত যে ফুলের সংবর্ধনা পেয়েছেন তার হিসেব নেই। আর ঘাতকের হাতে শহিদ হওয়ার পর থেকে স্মরণে-শ্রদ্ধায় ভালোবাসার তর্পণে-অর্পণে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন যেন ফুলের অপর নাম। ■

গবেষক, সাহিত্যিক

গল্প

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

জসীম আল ফাহিম

বাবা অফিস থেকে ফিরে আমার মাকে বললেন, ‘এই যে শুনছ! আগামীকাল আমরা কোথাও বেড়াতে যাব।’

বাবার কথা শুনে মা কৌতূহলী হয়ে বললেন, ‘কোথায় বেড়াতে যাবে?’

বাবা মিটিমিটি হেসে বললেন, ‘সেটা আপাতত বলছি না। রহস্য রেখে দিলাম। কিছুটা রহস্য থাকা ভালো।’

মা আর রহস্য ঘাঁটাতে গেলেন না। কোনো কিছু বললেনও না। বলে অবশ্য লাভও হবে না। কারণ মা বুঝে গেছেন বাবা আপাতত রহস্যের বিষয়টা বলবেন না।

পরে মা আমাকে বললেন, ‘রাফিদ! শুনেছিস তো। তোর বাবা আগামীকাল কোথাও বেড়াতে যাবেন। সাথে আমরাও যাব। তুই এখনই তোর ব্যাগটা রেডি করে ফেল।’

আমি বললাম, ‘জি আচ্ছা আম্মু।’

আমি আমার রুমে এসে ব্যাগ গোছাচ্ছি। আর মনে মনে ভাবছি–কোথায় বেড়াতে যাবেন বাবা! বাবা তো কিছু বললেন না। মাও বললেন না। বাবার কথায় কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কী সেই রহস্য! আমাকে তা জানতেই হবে। ভেবে আমি ধীর পায়ে বাবার কাছে গেলাম। মিনমিন করে বললাম, ‘আচ্ছা বাবা! আগামীকাল আমরা সত্যিই বেড়াতে যাব নাকি?’

বাবা জোর গলায় বললেন, ‘নিশ্চয়ই। তোর কোনো সন্দেহ আছে?’

আমি বললাম, ‘সন্দেহ নেই বাবা।’

তারপর বাবা একটু গম্ভীর ভাব ধরে রইলেন। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন। আমি মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলছ বাবা! কোথায় বেড়াতে যাব আমরা?'

বাবা কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, 'তার আগে পাঁচটি নদীর নাম বল তো শুনি?'

আমি বললাম, 'নদীর নাম তো আমি জানি বাবা।'

বাবা বললেন, 'জানিস বলছিস। তাহলে বলছিস না কেন–বল?'

আমি আর কী করি। বললাম, 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র।'

বাবা বললেন, 'বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো নদীটার নাম কী বল?'

আমি একটু চিন্তিত ভাব করে বললাম, 'বড়ো নদী! বড়ো নদী তো বাবা পদ্মা।'

আমার জবাব শুনে বাবা মৃদু হাসলেন। হেসে হেসেই বললেন, 'উত্তর ঠিক হয়েছে। দশে দশ পেয়েছিস।'

আমি বললাম, 'আপাতত দশে দশ আমার দরকার নেই বাবা। আগে বলো আগামীকাল আমরা কোথায় বেড়াতে যাব।'

আমার কথা শুনে বাবা একটু নীরব হয়ে রইলেন। জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করছেন বলে মনে হলো না। তারপর নীরবতা ভেঙে বাবা বললেন, 'বাংলাদেশের জাতীয় মাছের নাম কী রে?'

জবাবে বললাম,'ওটাও তো আমি জানি বাবা–ইলিশ মাছ।'

বাবা বললেন, 'ইলিশ মাছ খেতে কেমন বল।'

আমি বললাম, 'বড়োই সুস্বাদু!'

বাবা বললেন, 'এখন বল শুনি কোন নদীর ইলিশ মাছ খেতে বেশি সুস্বাদু।'

এবার আমি গভীর ভাবনায় পড়ে গেলাম। বললাম, 'উত্তরটা আমার জানা নেই বাবা।'

বাবা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বলিস কী রে বেটা! আমার ছেলে হয়ে তুই জানিস না যে পদ্মার ইলিশই বেশি সুস্বাদু। না না এটা হতে পারে না। এটা তোর জানা দরকার ছিল।'

আমি বললাম, 'এত কিছু আমি জানব কেমন করে বাবা? তাছাড়া সবাই সবকিছু জানে নাকি?'

বাবা বললেন, 'জানে না ঠিক আছে। তাই বলে তুইও জানবি না নাকি?'

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, 'সরি বাবা। ভুল হয়ে গেছে। এমনটি কখনো আর হবে না।'

আমার বিনয়াবনত কথা শুনে বাবা বেশ খুশি হলেন। ফিক করে তিনি হেসে দিলেন। বেশি খুশি হলে বাবা এভাবে হেসে ফেলেন। আমি বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বলোই না বাবা। আগামীকাল আমরা কোথায় বেড়াতে যাব?'

বাবা এবার মিটিমিটি হেসে বললেন, 'পদ্মা বহুমুখী সেতুটা কি আমাদের একবার দেখা দরকার না।'

বাবার কথা শুনে আমি খুশিতে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলাম, 'বুঝেছি পদ্মা সেতু দেখতে যাব আমরা! ওহ্ কী যে মজা হবে। যাই মাকে খবরটা দিয়ে আসি।'

আমি মায়ের উদ্দেশে ছুট লাগাবো, ঠিক এমন সময় বাবা খপ করে আমাকে ধরে ফেললেন। আমার কানে মুখ রেখে ফিসফিস করে বললেন, 'এই কথা তোর মাকে এখন বলা যাবে না। এটা তোর মায়ের জন্য সারপ্রাইজ, ওকে?'

আমি হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'ওকে বাবা।'

পরদিন সকালবেলা। জাতীয় পাখি দোয়েলের মিষ্টি গান শুনে আমার ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে জেগে আমি উঠোনে নেমে এলাম। আমাদের উঠোনের কোণে গন্ধরাজ ফুল গাছে কয়েকটি সাদা ফুল ফুটে আছে। ফুলের মিষ্টি সুবাস ছড়াচ্ছে। আমি ফুলেদের কাছাকাছি গেলাম। ফিসফিস করে বললাম, 'এই যে ফুলেরা! খবর কিছু শুনেছ? আজ আমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সেতুটা দেখতে যাব। সেতুর নাম–পদ্মা বহুমুখী সেতু। অনেক বড়ো সেতু। কী যে সুন্দর!'

ফুলেদের জবাব আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে সে সময় হঠাৎ এক পশলা হাওয়া দিলো। বাতাসের দোলায় ফুলগুলো হঠাৎ দুলে উঠল। দেখে মনে হলো আমার কথা শুনে ফুটন্ত গন্ধরাজ ফুলগুলো যেন খুশিতেই দুলে উঠল। দুলে দুলে ওরা

যেন বলছে, 'যাও। গিয়ে সুন্দর সেতুটা একবার দেখে এসো। তোমার জন্য ভোরের আশিস রইল।'

সে সময় কোথা থেকে যেন একটা ছোটো টুনটুনি পাখি উড়ে এল। পাখিটা কাছেই একটা ডালিম গাছের ডালে এসে বসল। তারপর সে ব্যস্ত হয়ে লেজ দুলিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। আমি টুনটুনি পাখিটাকেও পদ্মা সেতুর খবরটা জানালাম। আমার কথা শুনে পাখিটা কী বুঝল কে জানে। তবে সে খুশিতে টুনটুন টুইস টুইস বলে একবার গান গেয়ে ওঠল। ওর গান থামল না। গান চলতেই লাগল। পরক্ষণে আবার কী মনে করে যেন পাখিটা গান গেয়ে গেয়েই ডালিম গাছ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেল। দেখে আমার মনে হলো টুনটুনি পাখিটা যেন গানে গানে বলে গেল, 'শুভ হোক। তোমাদের পদ্মা সেতু দর্শন শুভ হোক।'

ততক্ষণে সুর্য্যি মামাটাও আলোক হেসে উঁকি দিলো। ঝলমল করে উঠল দশদিক। সূর্যের আলোয় ভোরের দূর্বা ঘাসে ঝুলে থাকা শিশিরকণা মুক্তোদানার মতো জ্বলছিল। আমি সকলকেই উদ্দেশ্য করে জানিয়ে দিলাম, 'শুনে রাখো তোমরা। আজ আমরা পদ্মা সেতু দেখতে যাব। এতদিন শুধু টেলিভিশনের পর্দায় সেতুটা দেখে এসেছি। আজ নিজের চোখে বাস্তবে দেখব।'

আমার কথা শুনে মনে হলো প্রকৃতিরাজ্যের সকলেই যেন খুব খুশি হয়েছে। মনে হলো পদ্মা সেতু তৈরি হোক এটা সকলেই প্রত্যাশা করেছিল। তাদের সেই প্রত্যাশা যেন আজ সফল হয়েছে। তাই ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে প্রকৃতি রাজ্যে আনন্দ জোয়ার বইছে।

সকাল দশটায় আমাদের বাড়ির সামনে সবুজ রঙের একটা সিএনজি এসে থামল। সিএনজিটা আমার বাবা আগেই ভাড়া করে রেখেছিলেন। আমরা সিএনজিতে উঠে বসলাম। ড্রাইভার পদ্মা সেতুর উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন। পদ্মা সেতুর কাছাকাছি পৌঁছাতে আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেল। সিএনজি থেকে নামতে নামতে আমার মা মিটিমিটি হেসে বললেন, 'আমি ধারণা করেছিলাম–পদ্মা সেতুই হয়ত হবে বেড়ানোর জায়গাটা। আমার ধারণাই দেখছি সত্যি হলো।'

মায়ের কথা শুনে বাবা কিছু বললেন না। শুধু মিটিমিটি হাসলেন। সিএনজি ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে আমার একটা হাত ধরে বাবা হাঁটতে শুরু করলেন। মা বললেন, 'আমরা এখন কোথায় যাব?'

জবাবে বাবা বললেন, 'একটা ইঞ্জিনের নৌকা ভাড়া করতে হবে। ইঞ্জিনের নৌকায় চড়ে আমরা কিছুসময় পদ্মা নদীতে ঘুরে বেড়াবো। সেতুটাকে একদম কাছে থেকে দেখব।'

আমার মনে তখন সে কী তোলপাড়! কারণ সেতু তো দূর থেকে দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু এই দেখা আর ওই দেখা কী এক হলো? বাবা বলেছেন ইঞ্জিনের নৌকা চড়ে আমরা কাছে থেকে পদ্মা সেতুটা দেখব। কাছে থেকে পদ্মা সেতু উপভোগের আনন্দে আমার মনটা উথালপাতাল করতে লাগল।

ইঞ্জিনের নৌকায় চড়ে আমরা পদ্মার বুকে ভেসে চলেছি। দূরে দেখা যাচ্ছে জেলেরা নদীতে মাছ ধরার জাল ফেলেছে। রুপালি নদীর জল সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। কতগুলো নৌকা রং-বেরঙের পাল উড়িয়ে দূরে কোথাও ধেয়ে চলেছে। আমাদের মাথার উপর দিয়ে আকাশে উড়ে চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে গাংচিল, শঙ্খচিল। আমি অবাক চোখে ওসব দেখছি। আর তন্ময় হয়ে ভাবছি। হঠাৎ আমার ভাবনার মাঝেই বাবা বললেন, 'রাফিদ! সেতুটা দেখতে কেমন রে?'

আমি বললাম, 'অপূর্ব বাবা! এত দীর্ঘ এত সুন্দর সেতু! আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

আমার জবাব শুনে বাবা হাসলেন। আমি বললাম, 'আচ্ছা বাবা এই সেতুটার দৈর্ঘ্য কত জানো?'

বাবা বললেন, 'এটা পৃথিবীর এগারোতম দীর্ঘ একটা সেতু। এর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ২২ মিটার।'

বাবার কথা শুনে আমি তো থ। কারণ আমি মনে মনে ভেবেছিলাম–একদিন এই সেতুটা হেঁটে হেঁটে পার হব। কিন্তু এত দীর্ঘ সেতু হেঁটে পার হতে গেলে তো আমার অনেক কষ্ট হবে। আমি আবার বেশি পরিশ্রম করতে পারি না। অল্প পরিশ্রম করলেই কেমন ক্লান্ত হয়ে যাই। মনে মনে ভাবি–বড়ো হলে নিশ্চয়ই আমি সেতুটা হেঁটে পার হতে পারব।

আমার মা এতক্ষণ একদৃষ্টে পদ্মা সেতুর শোভা উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ মা বললেন, 'ভালোই

তো হলো। মুন্সিগঞ্জ জেলার সঙ্গে শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলার সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হলো।'

মায়ের কথা শুনে বাবা বললেন, 'শুধু যে মুন্সিগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মাদারীপুরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে–তা কিন্তু নয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৯টি জেলার মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগ ত্বরান্বিত হবে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা বাবা! এই সেতু দিয়ে শুধু বাস আর ট্রাকই চলবে নাকি?'

আমার কথা শুনে বাবা বললেন, 'বোকা ছেলের কথা শোনো। এটা একটা দোতলা সেতু রে বেটা। এর ওপরতলা দিয়ে চলবে বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি এসব। আর নীচতলা দিয়ে চলবে বড়ো বড়ো রেলগাড়ি।'

বাবার কথা শুনে আমি রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কারণ সেতুও যে কখনো দোতলা হতে পারে, আমার জানা ছিল না। তাই বিড়বিড় করে বললাম–ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! পরে বাবাকে শুনিয়ে বললাম, 'কম করে হলেও এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন কয়েক শত যানবাহন চলাচল করতে পারবে, তাই না বাবা?'

আমার কথা শুনে বাবা হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। পরে হাসি থামিয়ে বললেন, 'বলিস কী রে তুই বেটা। মাত্র কয়েক শত যানবাহন! হা হা হা। এই সেতু দিয়ে দৈনিক গড়ে ৭৫ হাজার যানবাহন চলাচল করবে, বুঝেছিস?'

আমি অবাক কণ্ঠে বললাম, '৭৫ হাজার যানবাহন বাবা!'

আমার মা এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা সবই শুনছিলেন। এবার তিনিও মুখ খুললেন। বললেন, 'এই সেতুটা আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি।'

মায়ের কথা শুনে বাবা বললেন, 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পদ্মা সেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।'

সুদৃশ্য পদ্মা সেতুটা দেখতে দেখতে আমাদের নৌকাটি তীরের দিকে ছুটে চলল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত আমরা তীরে পৌঁছে যাব।

হঠাৎ বাবা বললেন, 'রাফিদ! পদ্মা সেতুটা কেমন দেখলি রে বেটা?'

আমি বললাম, 'খুবই চমৎকার সেতু বাবা! এমন সুন্দর একটা সেতু বাংলাদেশ সরকার তৈরি করতে পেরেছে, এটা আমাদের জন্য গৌরবের। আমার পক্ষ থেকে সরকারকে অভিনন্দন।'

আমার কথা শুনে বাবা বলেন, 'এই সেতুর স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু কন্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দূরদর্শিতার জন্যই এই অসাধ্য সাধন হয়েছে।'

বাবার কথা শুনে আমি বললাম, 'জননেত্রী শেখ হাসিনাকেও অভিনন্দন জানাই। আজকের বেড়ানোটা আমার মনের মাঝে অনেকদিন গাঁথা হয়ে থাকবে।'

আমার কথা শুনে মা বললেন, 'শুধুই কী গাঁথা হয়ে থাকবে! আর কিছু না রে খোকা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ মা। পদ্মা সেতুটা আমার বড়ো পছন্দ হয়েছে। বড়ো হয়ে আমিও এ রকম একটা কিছু তৈরির স্বপ্ন দেখি।' ■

শিশু সাহিত্যিক

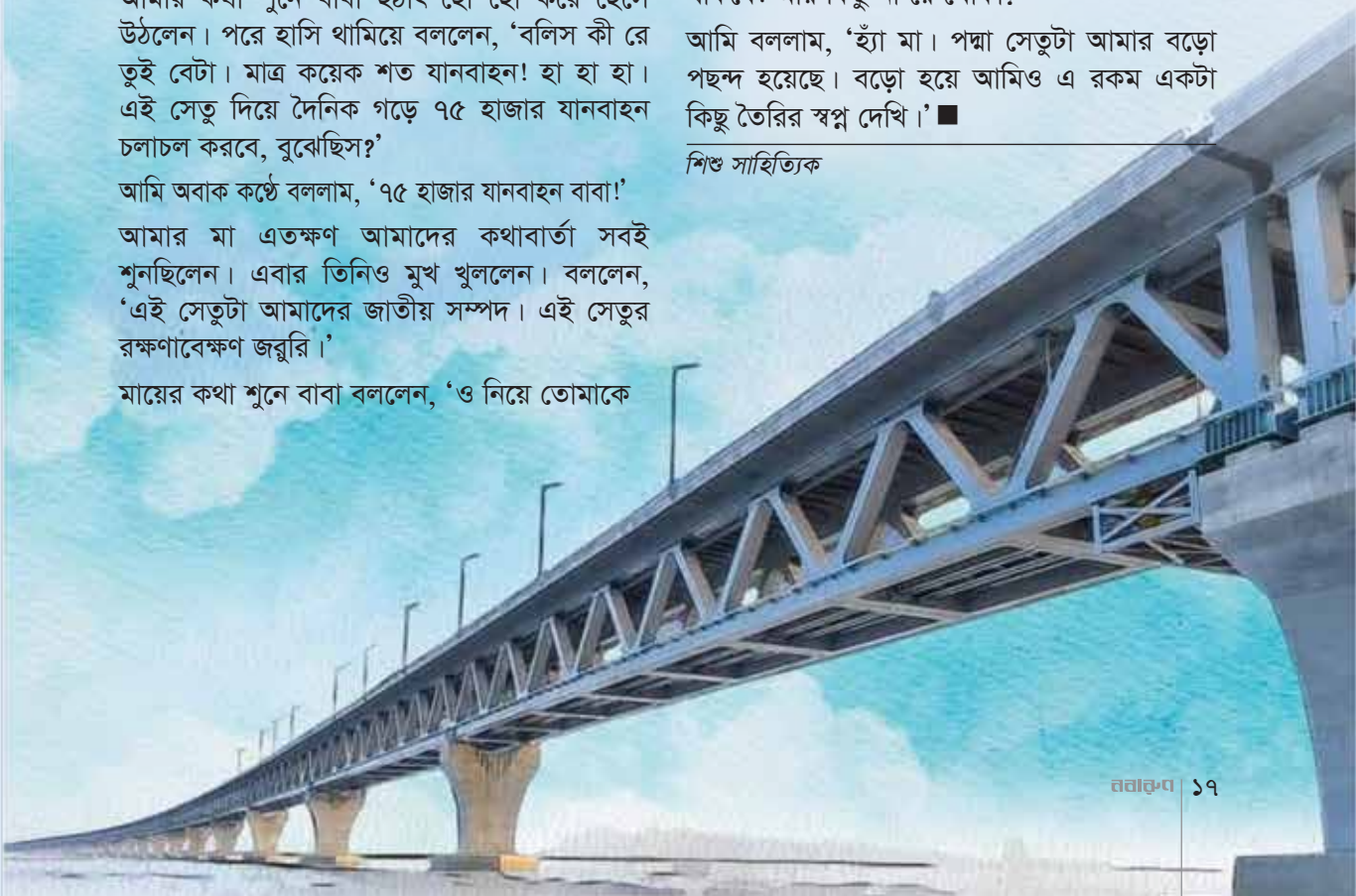

সবার সেতু

আবদুল লতিফ

একটি সেতু একটি জাতির
নতুন পরিচয়
যেই সেতুটি হতে দেখে
বিশ্ব অবাক হয়।
সেই সেতুটি পদ্মা সেতু
দেশের টাকায় গড়া
যেই সেতুটির উপর সবাই
রাখছে নজর কড়া।
কেউ বলছে বাহবা বেশ
অতি চমৎকার
কেউবা আবার হিংসা করে
বলছে কদাকার।
খরস্রোতা পদ্মার উপর
অবাক করা সেতু
কি লাভ তাতে খুঁজে
মন্দ কোনো হেতু।
পদ্মা সেতু সবার সেতু
মনে গেঁথে নিয়ে
মিলেমিশে চলব সবাই
এই সেতুটি দিয়ে।

পদ্মা সেতু

সোহানা আকতার

দেখো দেখো দেখো ঝলক
পদ্মা সেতু এক পলক
হু হু করে ছুটছে গাড়ি
বাড়ি যাবো তাড়াতাড়ি
পদ্মা সেতু দেবো পাড়ি
আসবে টাকা কাড়ি কাড়ি।
দেশের বড়ো পদ্মা সেতু
কোটি বাঙালির স্বপ্নহেতু
শেখ হাসিনার উন্নয়ন
দেশ ও দশের উন্নত জীবন।

পদ্মা সেতু দেশের বিস্ময়
পদ্মাতেই স্বপ্নজয়।
আমাদের গর্ব শেখ হাসিনা
শেখ মুজিবের রত্নকন্যা
ধন্য ধন্য ধন্য দেশ
জয় জয় বাংলাদেশ।

দেশের গৌরব

মুস্তফা হাবীব

পদ্মা নদীর পদ্ম নিয়ে
স্বপ্ন কত জনের,
পদ্মা নিয়ে কবি নজরুল
সুর ঢেলেছে মনের।

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের
উন্নয়নের ধারা,
খুশির ঢেউয়ে ভাসছে মানুষ
যেন আত্মহারা।

পদ্মা সেতু দখিন বাংলার
পালটে দিলো রূপ,
মুগ্ধ চোখে হারিয়ে যাই
ভালো লাগে খুব।

পদ্মা নদীর বুকের ওপর
মেলছে ডানা পাখি,
দেখে মোদের হৃদয় নাচে
নাচে যুগল আঁখি।

পদ্মা সেতু দেশের গৌরব
গর্বে দোলে বুক,
ঝর্ণা হয়ে ছড়িয়ে দেয়
মনের ভেতর সুখ।

ভালোবাসার পদ্মা সেতু

আরিফুর রহমান

পায়ে হেঁটে পদ্মা সেতু পাড়ি

প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন করে পাড়ি দেওয়ার পর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর বাঁধভাঙা মানুষের জোয়ার নামে পদ্ম সেতু পাড়ি দেয়ার জন্য। পায়ে হেঁটে সেতু পাড়ি দিয়েছেন অনেকেই।পরে আর কখনো পায়ে হেঁটে পদ্মা সেতু পাড়ি দেওয়ার সুযোগ না থাকায় অনেকেই এ সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন।

সেতুর উপর দিয়ে দ্রুত গতির যানবাহন চলবে বিধায় পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে করে পদ্মা সেতু পাড়ি দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন করায় পদ্মা সেতুর স্বপ্নের দুই দশকের যাত্রা আজ বাস্তব। বহুল প্রতীক্ষিত সেতুটির নাম সেতু বিভাগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে রাখার প্রস্তাব করলেও প্রধানমন্ত্রী তা নাকচ করে দেন। শতভাগ দেশীয় অর্থায়নে ৩০,১৯৩.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে ঢাকার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে নতুন দ্বার উন্মোচন করবে এ সেতু।

পদ্মা নামের রোবট

সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে পদ্মা নামে রোবট তৈরি হয়েছে বিল্ট ইন সফটওয়্যারের নিজস্ব ল্যাবে। পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধনের ক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতেই এমন নামকরণ বলে জানানো হয়।

রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশন ও আগুন নেভাতে সাহায্য করার মতো কাজ করতে পারবে পদ্মা রোবটটি। এমনকি পদ্মা সেতু সম্পর্কিত সব তথ্য উপস্থাপন করতে পারবে। রোবট পদ্মা সব মানুষকে চিনতে পারবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাজিরা শনাক্তের কাজ করবে।

বাড়ির আঙিনায় পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতুর আদলে সেতু বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ঢাকার ধামরাইয়ের সুতিপাড়ার ছেলে সোহাগ। সে ভালুম আতাউর রহমান খান স্কুল ও কলেজে ব্যবসা শাখার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

বাঁশ, সিমেন্ট, মাটি ও রং দিয়ে রূপ দিয়ে সোহাগ নিজ বাড়িতে অবিকল পদ্মা সেতুর আদলে একটি সেতু তৈরি করেছে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু করে সোহাগ। এর আগে ২০১৯ সালে একটি সেতু তৈরি করেছিল। সেতুটি শুধু মাটি ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করায় নির্মাণের কিছুদিন পরই ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। পরে হুবহু পদ্মা সেতু বানানোর পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালের ১লা নভেম্বর নির্মাণ কাজ শুরু করে। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর ২৬শে মার্চ তার পদ্মা সেতু বানানোর কাজ শেষ হয়।

সেতুটি তৈরিতে মাটি, বাঁশ, সিমেন্ট এর পাশাপাশি মোবাইলে ব্যবহার করা ছোটো বাতি ও সাদা-কালো রং ব্যবহার করা হয়েছে। চারটি লেন করে স্থাপন করা হয়েছে বাতি। নিচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে

রেললাইন। মাটি খুঁড়ে রূপ দেওয়া হয়েছে পদ্মা নদীর। দুই লেনের মাঝখানে ফুলের চারাসহ এক প্রান্তে রয়েছে চেকপোস্ট। এক কথায় প্রাণবন্ত একটি পদ্মা সেতু। দেখে মন ভরে যায় দর্শনার্থীদের।

ওরা ১১ জন

স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের দিনকে মানুষের জন্য বিশেষ দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর বিশেষ দিনটিকে আরও বিশেষ করে রাখল গোপালগঞ্জের ১১ জন কিশোর। সেতু দেখতে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থেকে সাইকেল চালিয়ে এসেছে তারা। বৃষ্টির মধ্যেই পিচ্ছিল পথে ৫৩ কিলোমিটার সাইকেল চালাতে হয়েছে তাদের। পদ্মা সেতুর ৮ কিলোমিটার আগে পাচ্চর এলাকায় ঝুম বৃষ্টিতে পড়েন ১১ কিশোর। কিন্তু বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ভিজে চুপচুপ হয়েও তারা এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে।

এই ১১ জন মুকসুদপুরের দিকনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সকাল ৮টায় দিকনগর থেকে সাইকেলযোগে রওনা হয় ওরা। পথে কোনো বিশ্রামই নেয়নি। ওরা ১১ জনের মতে, যেদিন শুনেছি ২৫শে জুন স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন হবে, সেদিনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা সেতু দেখতে যাব।

পদ্মা সেতুতে প্রাণী জাদুঘর

কোটি মানুষের স্বপ্ন আর অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক পদ্মা সেতু। তবে প্রমত্তা নদীর বুকে সেতু নির্মাণ ছাড়াও এ প্রকল্পের রয়েছে আরও নানা উদ্যোগ। যার মধ্যে একটি পদ্মা সেতু জাদুঘর। সেতু এলাকা ও পদ্মা নদীর জীববৈচিত্র্যের নমুনা সংগ্রহ করে তৈরি করা হচ্ছে ব্যতিক্রমী এই জাদুঘর। বর্তমানে মুন্সিগঞ্জের দোগাছি এলাকায় পদ্মা সেতু প্রকল্পের সার্ভিস এরিয়া-১ এ অস্থায়ীভাবে জাদুঘরটি রয়েছে। তবে অচিরেই স্থায়ী ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের জন্য জাদুঘরটি উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষের।

সরেজমিন দেখা যায়, পদ্মা নদী ও নদীকে ঘিরে বসবাসকারী বৈচিত্র্যময় প্রাণীর নমুনার বিশাল এক সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে। কৃত্রিমভাবে সংরক্ষণ করা হলেও প্রতিটি প্রাণীই যেন জীবন্ত অবস্থায় রয়েছে বলে মনে হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০১৬ সালে পদ্মা সেতু জাদুঘর তৈরিতে প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে জাদুঘরটি বাস্তবায়ন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগ।

জাদুঘরের কিউরেটর সুমন মন্ডল জানান, এক হাজার ৪১৯ প্রজাতির প্রাণীর মোট দুই হাজার ৩৫২টি নমুনা রয়েছে এই জাদুঘরে। দেশের সবচেয়ে ছোট থেকে সবচেয়ে বিরলতম মাছ রয়েছে জাদুঘরটিতে। এছাড়াও এখানে রয়েছে ৩৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর ৯২টি নমুনা, ১৭৭ প্রজাতির পাখির ৪৪০টি নমুনা, ৭৫ প্রজাতির সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর ২০০টি নমুনা, ৩২৮ প্রজাতির মাছের ৩৪৩টি নমুনা, ৩০৪ প্রজাতির শামুক-ঝিনুকের ৩১১টি নমুনা, ৬৩ প্রজাতির চিংড়ি-কাঁকড়ার ৭০টি নমুনা, ২০৯ প্রজাতির পোকামাকড়ের ৩৭৩টি নমুনা, ১৮০ প্রজাতির প্রজাপতি ও মথের ২৩১টি নমুনা রয়েছে।

এছাড়া এই জাদুঘরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ৪৮ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ৬৬টি নমুনা, ২২টি কঙ্কাল ও দেহাবশেষ। বিভিন্ন প্রাণীর ২৫টি ডিমের, ৪৮টি বাসার নমুনাও এখানে রয়েছে। এছাড়াও ৬১ ধরনের মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং নদীর বুকে চলা ২০ ধরনের নৌকার নমুনাও রয়েছে।, পদ্মা নদীতে কোন কোন প্রাণী বাস করতো? নতুন করে করে কোন কোন প্রাণী বাস করছে তার পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র দেখা যাবে এই জাদুঘরে।

বিস্তৃত পদ্মা নদী ও নদীকে ঘিরে আশেপাশে শতশত প্রাণীর বাস। এসব প্রাণী-বৈচিত্র্যের ইতিহাস সংরক্ষণ ও সবার কাছে তুলে ধরার জন্যই এই জাদুঘর। তবে কোনো প্রাণীকে হত্যা নয়, মৃত প্রাণী সংগ্রহ করেই নমুনা তৈরি করা হয়েছে। ইতিহাসের সংগ্রহশালার পাশপাশি শিক্ষা, গবেষণা ও বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এই জাদুঘর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও আধুনিক উপায়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করায় সঠিক রক্ষণাবেক্ষণে শতবছর পর্যন্ত টিকে থাকবে এসব নমুনা। ■

প্রাবন্ধিক

পদ্মা সেতু

প্রসেনজিৎ কুমার দে

স্বপ্নের পদ্মা সেতু
নয় তো স্বপ্ন আর–
বর্ণিল উৎসবে খুলল দখিন দুয়ার
জনমনে এল আনন্দের জোয়ার।
স্রোতস্বিনী পদ্মায় শ্যাওলা জমে না
তেজে ভেসে যায় সব বাধা,
আমরা বঙ্গবন্ধুর সৈনিক–
আমাদের কেউ 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'।
স্পর্ধায় মাথা তুলেছে আজ পদ্মা সেতু
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তোমার জয়তু।
কমেছে দূরত্ব, হয়েছে সহজ রাস্তা
আমরাও পারি– জন্মেছে আমাদের আস্থা,
চারদিকে জয়ের উচ্ছ্বাসে দেশ
ধন্য ধন্য পদ্মা সেতুর বাংলাদেশ।

আষাঢ়ের রূপবৈচিত্র্য

শেখ একেএম জাকারিয়া

নূপুর পায়ে রিনিঝিনি শব্দে নৈসর্গিক বাংলাদেশে যে মাসের আগমন ঘটে সে আষাঢ়। বর্ষাঋতুর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় এ মাসের প্রথম দিন থেকে। বাংলা বর্ষপঞ্জির আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসব্যাপী (১৫ই জুন থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত) কালপর্ব-ই বর্ষাকাল, যা গ্রীষ্মের পরবর্তী ও শরতের পূর্ববর্তী ঋতু। আমাদের দেশে আষাঢ় বাংলা সনের তৃতীয় মাস যা বর্ষা ঋতুর অন্তর্ভুক্ত দু'মাসের প্রথম মাস। বাংলাদেশে অপরাপর মাসের মতো আষাঢ়ের নাম প্রদানও হয়েছে নক্ষত্রের নামে। বইপত্রাদি পাঠে জানা যায়, নামটি এসেছে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থান থেকে। অথৈ পানি তার বৈভব। আষাঢ়ের অথৈ পানি, বাদল দিনে ফোটা কদম ফুলসহ পাহাড়-নদী-বন প্রভৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট প্রকৃতির চেতনা প্রতিটি প্রকৃতিপ্রেমিক মনকেই আন্দোলিত করে। কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-চিত্রশিল্পীর বেলায় তো এর আবেদন আরও বেশি। এ সময়ে আরও ফোটে শাপলা, পদ্ম, চালতা, কেতকী ফুল যা মানব মনকে যথার্থই রোমাঞ্চিত করে।

দেশীয় কবি লেখকগণ বিভিন্ন সময়ে বর্ষার প্রথম মাস আষাঢ়কে নারীর রূপকল্পে চিত্রিত করেছেন। বর্ষা ঋতুকে কবিতা-ছড়ায়, গল্প-নাটকে, কিংবা উপন্যাসে স্থান দেননি এমন লেখক বাংলাসাহিত্যে খুব কম-ই আছেন। খ্যাতিমান কবি শেখর কালিদাস বর্ষা নিয়ে অনেক পদ্য-কবিতা লিখেছেন। বাংলাসাহিত্যে 'ছন্দের জাদুকর' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ষা নিয়ে রচিত কবিতা বর্ষা, ইলশে গুঁড়ি ও বর্ষা নিমন্ত্রণ পাঠকের মনকে এখনো নাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষাপ্রণয় তো যথারীতি উপদেশসংবলিত উক্তিতুল্য। তাছাড়া আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লি কবি জসীম উদ্দীন প্রমুখ কবিগণ বর্ষাকে তাদের সৃষ্টিশীল কাজে উত্থাপন করেছেন নানারকম শিল্পনৈপুণ্যে। চিত্রকররা বর্ষাকে

ক্যাম্বিসে আঁকতে খুব পছন্দ করেন। স্বনামখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের 'বৃষ্টির দিনে খেয়া ঘাট' শিরোনামবিশিষ্ট চিত্রশিল্পটি আজও অদ্বিতীয়। মধুমাস খ্যাত জ্যৈষ্ঠ মাসের সুস্বাদু ফলের সমাহার এ মাসে এসেও লক্ষণীয়। তার মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু আনারস, লুকলুকি, ভুবি, জামরুল উল্লেখ্য।

আষাঢ় মাসের আরেকটি নাম যজ্ঞের মাস। 'বারো মাসে তেরো পূজা' উদযাপনকারীদের কাছে এ মাস অনেক শ্রদ্ধার। এ মাসেই আমাদের দেশসহ পুরো ভারতে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা রথযাত্রা যজ্ঞ পালন করে থাকে। রথযাত্রা যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতের মতো আমাদের দেশেও প্রতিবছর জেলা উপজেলায় মেলা বসে। দেশে মেলা মানেই বারোয়ারি পরমানন্দ। বাংলাদেশে রথযাত্রা উপলক্ষে সবচে' বেশি মেলা বসে ময়মনসিংহ জেলায়। এছাড়া সুনামগঞ্জ, জামালপুর, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, ফরিদপুর জেলা উল্লেখ্য। তবে ঢাকা বিভাগের ধামরাই ও মানিকগঞ্জের রথযাত্রা যজ্ঞের সুনাম সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত। বর্ষা ঋতু আমাদের জন্য ক্ষতিকারক না লাভজনক এ নিয়ে মানব মনে আছে নানা প্রশ্ন। বর্ষার অথৈ জলপ্রবাহ সাধারণ মানুষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করলেও প্রকৃতিকে করে দেয় ফুরফুরে মেজাজের। বন্যার বা নদীপ্রবাহের ঘোলা জল থেকে থিতিয়ে-পড়া নরম মাটির স্তর বা প্রলেপ অর্থাৎ পলিমাটি এসে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হিসেবে আমাদের দেশকে প্রতি বছর নতুনভাবে নির্মাণ করে বর্ষা ঋতুই। এদিক থেকে বর্ষা ঋতু আমাদের জন্য এক মহা আশীর্বাদ। তবে দেশীয় পরিবেশবিদরা বলেছেন, জলবায়ুগত পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ক্ষণস্থায়ী কিংবা প্রলম্বিত হচ্ছে। লোকশ্রুতি আছে বর্ষা– 'কারো জন্য পৌষ মাস, কারো জন্য সর্বনাশ'।

বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সূত্রধর যারা আছে তাদের অধিকাংশই কাঠের মিস্ত্রি। যাদের আরেক নাম ছুতোর। ছুতোর সম্প্রদায় এ সময় নৌকা বানাতে খুব ব্যস্ত থাকে। রাতদিন কাজ করে তারা বিভিন্ন আকৃতির কাঠের নৌকা বানায়। তারমধ্যে গলুই ওয়ালা নৌকা, কোষা নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা উল্লেখ্য। আষাঢ়ের নতুন পানিতে গ্রামাঞ্চল মৎস্যজীবীসহ সাধারণ মানুষজন প্রতিদিন মাছ শিকারে বের হয়। এমনকি বৃষ্টিহীন রাতের বেলা মাছ শিকারের নিমিত্তে ধনী গৃহস্ত লোকও নৌকাযোগে আলউয়ারা দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আলউয়ারাতে গ্রামের লোকজন ছোটো-বড়ো নানা প্রজাতির মাছ শিকার করে থাকে। এ সময় চাঁদনি কিংবা আঁধার রাতে চারদিক থেকে ব্যাঙের ডাক 'ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ' ভেসে আসে । রাতের বেলা ব্যাঙের এই ডাক অনেক শ্রুতিমধুর। এসময় আষাঢ়কে মনে হয় সংগীত ও স্বপ্নের রাজ্য। ভাবুক মনকে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। বাংলাদেশের মানুষজন প্রতি বছর এভাবেই আষাঢ় মাসে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বর্ষাকে বরণ করে নেয়। ■

প্রাবন্ধিক

বর্ষা এলে

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

বর্ষা এলে পাঁপড়ি মেলে
হাসে কদম ফুল
বিলেঝিলে মুক্ত দিলে
শাপলারা খায় দুল ।

বর্ষা এলে ডানা মেলে
ইষ্টিকুটুম গায়
নৌকা বেয়ে মাঝি গেয়ে
ভাটির দেশে যায়।

বর্ষা এলে দেশের জেলে
ধরে জলে মাছ
কষ্ট ভুলে পেখম তুলে
ময়ূর করে নাচ।

দূরের আকাশ ভরলে মেঘে

ফারুক নওয়াজ

দূরের আকাশ ভরলে মেঘে নামলে আঁধার বনে
রবি ঠাকুর তখন তোমায় দারুণ পড়ে মনে।
ঝিমঝিমানো ইমলিবীথি
বিজলি হঠাৎ কাটলে সিঁথি
চমকে উঠে সজনেশাখা থথরিয়ে নড়ে...
ভাবি তখন ঘুরছ তুমি পদ্মা বোটে চড়ে।

সাঁঝ মনে হয় আষাঢ়-দুপুর পায়রা লুকায় খোপে
চুপচুপিয়ে ডাহুক ডাকে দুধচাপিয়ার ঝোপে
গুটগুটিয়ার ধূসর ছায়া
বাড়ায় যদি দূরের মায়া
স্মৃতির আবেশ দোলায় যদি মায়ের মুখোচ্ছবি–
রবি ঠাকুর তখন আমি তোমার মতোই কবি।
রবি ঠাকুর তখন আমি মায়ের গন্ধ পাই
তখন আমি টাপুরটুপুর মেঘের ছন্দ পাই
তখন আমি তোমার মতো উদাস হয়ে যাই
তখন আমার মনটা ছোটে দূরে বারতায়!
তখন যদি উচ্ছে মাচায়
শিসটি দিয়ে পুচ্ছ নাচায়
মিষ্টি সুরের দোয়েল পাখি পুবের আঙিনায় –
রবি ঠাকুর তখন মেঘে তোমায় দেখা যায়।

কোলা ব্যাঙের ডাক

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

মুষলধারে বৃষ্টি হলো
ডাকছে কোলা ব্যাঙ,
একটু থামে আবার ডাকে
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাং।

ব্যাঙগুলো সব ডাকছে কেন
ঘর ভেঙেছে নাকি?
কান্না করে বলছে ওরা
কেমনে কোথা থাকি!

খোকা-খুকু ব্যাঙের বাড়ি
করতে যাবে খোঁজ,
ব্যাঙের বাসায় কী থাকে আর
কী করে সে ভোজ।

বৃষ্টি নেই যেখানে

আবু রোহান আহমেদ

পৃথিবীর বৈচিত্র্যতার শেষ নেই। কোথাও রুক্ষ কঠিন। কোথাও বা সবুজের সমারোহ। কোথাও ধূসর মরু প্রান্তর। আবার অন্য কোথাও সমুদ্র জলরাশি এই বৈচিত্র্যতার আরেক নিদর্শন পশ্চিম-মধ্য এশিয়ার ইয়েমেনের একটি গ্রাম। যেখানে মেঘ জমলেও বৃষ্টি হয় না। রুক্ষ কঠিন পাহাড়ের বুকে গড়ে ওঠা এই গ্রামে দশকের পর দশক বৃষ্টি ছাড়াই জীবন পার করছে গ্রামবাসীরা।

বৃষ্টি প্রকৃতির এক অনন্য আশীর্বাদ। বৃষ্টি হয় বলেই প্রকৃতি এত সুজলা-সুফলা। বালুময় মরুভূমি থেকে সবুজ সমতল কিংবা পাহাড়ি এলাকা পৃথিবীর সব অঞ্চলে কম বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তবে পৃথিবীতে এমন একটি গ্রাম আছে যেখানে কখনো বৃষ্টি হয় না। এটি মরুভূমির কোনো স্থান নয়। আরো অবাক করা বিষয় হলো এখানে রীতিমতো মানব বসতি রয়েছে। আরো রয়েছে সুন্দর বাড়িঘর ও প্রাচীন স্থাপনা। গ্রামটির নাম আলহুতাইব। ইয়েমেনের রাজধানী সানার প্রশাসনিক এলাকা জাবল হারজের পার্বত্য অঞ্চলে এর অবস্থান। বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম এটি। পাহাড়ের কোলে পাথর কেটে কেটে বাড়িগুলো যেভাবে তৈরি করা হয়েছে, তা নৈসর্গিক। প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকতার মিশেল গ্রামটির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এখানে স্কুল, মাদ্রাসা-মসজিদ সবই রয়েছে। এমনকি ষোড়শ শতকের একটি স্থাপনাও আছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক আর দশটা গ্রামের মতোই। তবে অন্য গ্রাম থেকে এর পার্থক্য হচ্ছে, অন্য গ্রামগুলো যখন বছরের কোনো না কোনো সময় বৃষ্টিতে ভিজে সিক্ত হয় সেখানে আলহুতাইব থাকে শুকনো খটখটে। দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম। রাতের দিকে হিমশীতল ঠান্ডা নেমে আসে গ্রামে। কিন্তু সূর্য উঠতেই আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

কারণ আর কিছুই নয়। সমতল থেকে গ্রামটির অবস্থান উঁচুতে। সমতল থেকে আলহুতাইব প্রায় ৩২০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এই উচ্চতার কারণেই এখানে বৃষ্টিপাত হয় না। কারণ স্বাভাবিক বৃষ্টির মেঘ জমে সমতল থেকে ২০০০ মিটার উঁচুতে। ফলে মেঘ জমে যে বৃষ্টি হয় তা আলহুতাইবের নিচে ঝরে পড়ে। লাল বালি পাথরের পাহাড়ের মাথার গ্রামটিতে আল-বোহরাজন জাতির লোক বাস করেন। এই প্রকৃতির সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়ে বংশ পরম্পরায় বসবাস করছে সেখানের বাসিন্দারা।■

শিক্ষার্থী, ইউল্যাব ইউনিভার্সিটি

পদের শ্রেণিবিভাগ

তারিক মনজুর

পিলটু অনেকদিন ধরে একটা কথা ভাবছিল। বাংলা ব্যাকরণে পদ পাঁচ প্রকার। আর ইংরেজি ব্যাকরণে পদ আট প্রকার। এ কারণেই হয়ত বাংলা আর ইংরেজি ভাষার মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে।

বিকালবেলা পিলটু খেলার মাঠে গিয়ে বিষয়টা নেহাকে বলল। নেহা শুনে অবশ্য ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল। বলল, 'আমার তা মনে হয় না। তবে পদ নিয়ে আমার মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে।'

সেদিন বিকালে ওরা তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে চলে গেল নদীর ধারে। ভাষা-দাদুর কাছে যাবে শুনে বিনু আর শাফিও যোগ দিল। প্রতিদিন বিকালে ভাষা-দাদু নদীর ধারে হাঁটেন। তারপর সেখানে খানিকক্ষণ বসে থাকেন। আজও নদীর ধারে বসেছিলেন। তারপর যখন উঠতে গেলেন, তখন পিলটু-নেহা-বিনু আর শাফিকে দেখে বসে গেলেন। বললেন, 'আজকে খেলা বন্ধ নাকি?'

'না, দাদু, খেলা বন্ধ না।' বিনু বলে। সবসময় দেখা যায় বিনুই আগে কথা বলে ওঠে।

'তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে তোমার কাছে এসেছি। পদ নিয়ে একটা প্রশ্ন করব বলে।' পিলটু যোগ করে।

'কী আপদ! পদ নিয়ে আবার কেউ বিপদে পড়ে নাকি?' ভাষা-দাদু একটু মজা করেন।

পিলটু কোনো ভূমিকা ছাড়াই শুরু করে, 'আচ্ছা, দাদু, বাংলা আর ইংরেজি ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাই না? আমার মনে হয় এর কারণ– বাংলা ব্যাকরণে পদ পাঁচ প্রকার আর ইংরেজিতে পদ আট প্রকার।'

ভাষা-দাদু ভ্রু কুঁচকে পিলটুর দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাদের বিজ্ঞানে দক্ষ পিলটু শুরুতেই একটা ভুল করছে।' ভাষা-দাদুর কথা শুনে সবাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। পিলটু আবার কী ভুল করল কেউ বুঝতে পারছে না। দাদু বলতে থাকেন, 'প্রথমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিজ্ঞানের পদ্ধতি নয়। বরং পরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসতে হয়।'

পিলটু বলে, 'তাহলে, দাদু, তুমিই বলো, বাংলা আর ইংরেজি ভাষার মধ্যে পার্থক্য কেন?'

'বাংলা আর ইংরেজি ভাষার মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি মিলও আছে।' ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'এই মিল লক্ষ্য করেই ভাষা-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, এ দুটি ভাষা একই বংশ থেকে এসেছে।'

'এই বংশের নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ।' নেহা মাঝখানে যোগ করে।

ভাষা-দাদু হাসেন। বলেন, 'ভালোই মনে আছে দেখছি।'

‘তাহলে, এক ভাষায় পদ পাঁচ প্রকার। আরেক ভাষায় পদ আট প্রকার কেন?’ পিলটু জিজ্ঞাসা করে।

ভাষা-দাদু খানিকক্ষণ চুপ থেকে পিলটুর দিকে তাকালেন। বললেন, ‘তুমি ভাষা আর ব্যাকরণকে মিলিয়ে ফেলছ। ব্যাকরণ কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করে। ব্যাকরণে বর্ণনার পার্থক্য থাকতে পারে; এ কারণে দুটি ভাষা আলাদা হয়ে যায় না। আবার উলটোভাবে বলা যায়, ব্যাকরণে মিল থাকার কারণে দুটি ভাষা এক হয়ে যায় না।’

ভাষা-দাদুর কথা শুনে পিলটু অবাক হয়ে গেল। অন্যরাও অপেক্ষা করতে লাগল এরপর ভাষা-দাদু কী বলেন। দাদু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেন, ‘বাংলা ব্যাকরণে পদ পাঁচ প্রকার। সংস্কৃত ব্যাকরণেও কিন্তু পদ পাঁচ প্রকার। তাই বলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা এক নয়। আবার ইংরেজি ভাষার মতো বাংলা ব্যাকরণেও পদকে আট ভাগ করে আলোচনা করা যাবে।’

‘বাংলা ভাষায় আট প্রকার পদ কি আছে?’ বিনু আকাশ থেকে পড়ে।

‘ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটা শব্দকে পদ বলে। এই পদকে ব্যাকরণে দুই ভাগে, চার ভাগে, পাঁচ ভাগে, আট ভাগে – সুবিধাজনক যে-কোনো উপায়ে বর্ণনা করা যায়। বর্ণনার কারণে ভাষার রূপ বদলে যাবে না। ভাষা যেমন ছিল, তেমনই থাকবে। শুধু ব্যাকরণে পদের প্রকার যাবে পালটে।’

নেহা বলল, ‘আমার মাথায় এই প্রশ্নটাই এসেছে। আমাদের নতুন বাংলা ব্যাকরণে পদকে আট ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এটা কি ঠিক হয়েছে?’

‘তাই নাকি! পদ আট প্রকার!’ অন্যরা চমকে ওঠে। বিনু বলল, ‘আমার মনে হয়, ছাপার ভুল।’

নেহা বলল, ‘ছাপার ভুল না। উদাহরণ দিয়ে দিয়ে আট প্রকার পদের আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজি ব্যাকরণের মতো বাংলা ব্যাকরণেও পদ আট প্রকার। এতে কোনো সমস্যা হবে না দাদু?’

‘ভাষাকে বর্ণনা করে ব্যাকরণ। বর্ণনার সুবিধার জন্য পদকে আট শ্রেণিতে ভাগ করে দেখানো যেতেই পারে। তবে, আগে আমাকে আট প্রকার পদের নাম বলো।’

‘১. বিশেষ্য, ২. সর্বনাম, ৩. বিশেষণ, ৪. ক্রিয়া, ৫. ক্রিয়াবিশেষণ, ৬. অনুসর্গ, ৭. যোজক ও ৮. আবেগ।’ একটু থেমে থেমে নেহা আট প্রকার পদের নাম বলে।

শাফি এতক্ষণ চুপ ছিল। সে বলল, ‘ও মা! এ কেমন কথা? এতদিন জানতাম, পদ পাঁচ প্রকার।’ আঙুলে গুণে গুণে সে নামগুলো শোনায়, ‘বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়।’

‘তাহলে কী ঘটেছে বুঝতে পারছ?’ ভাষা-দাদু বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করেন, ‘বিশেষণ থেকে এখন ক্রিয়াবিশেষণকে আলাদা করা হয়েছে। আর বিভিন্ন ধরনের অব্যয়কে অনুসর্গ, যোজক আর আবেগ শব্দে ভাগ করে দেখানো হয়েছে।’

‘এখন, দাদু, বাংলা ব্যাকরণ কঠিন হয়ে যাবে না?’ বিনু প্রশ্ন করে।

দাদু হেসে বলেন, ‘এখন তো তোমাদের জন্য আরও সহজ হয়ে যাবে। ইংরেজি ব্যাকরণের আট প্রকার পদের সাথে মিলিয়ে বাংলা আট প্রকার পদ পড়তে পারবে।’

‘মানে?’ বিনু সব সময় সবকিছু ব্যাখ্যাসহ বুঝে নিতে চায়।

ভাষা-দাদু বলেন, ‘ইংরেজি ব্যাকরণে কোনো নামকে বলে Noun; বাংলা ব্যাকরণে বলে বিশেষ্য। Noun-এর বদলে যা বসে তাকে বলে Pronoun; বাংলা ব্যাকরণে একে বলে সর্বনাম। বৈশিষ্ট্য বা গুণকে ইংরেজি ব্যাকরণে বলে Adjective; বাংলা ব্যাকরণে বিশেষণ। কাজকে বলে Verb; বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়া। ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে Adverb; বাংলা ব্যাকরণে এখন একে বলা হচ্ছে ক্রিয়াবিশেষণ। এইভাবে Preposition, Conjunction, Interjection-এর বদলে পাবে অনুসর্গ, যোজক আর আবেগ।’

‘তাহলে তো বাংলা ব্যাকরণ পড়তে আর ভয় করবে না।’ শাফি বলে।

ভাষা-দাদু এবার পশ্চিম আকাশের দিকে তাকালেন। বললেন, ‘সন্ধ্যা হতে কিন্তু দেরি নেই।’ তারপর পিলটুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দেখো পিলটু, ইংরেজি ব্যাকরণে এতদিন পড়েছ পদ আট প্রকার। এখন বাংলা ব্যাকরণেও বর্ণনা করা হচ্ছে পদ আট প্রকার। এই মিলের কারণে দুটি ভাষা কিন্তু এক হয়ে গেল না।’ ■

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গল্প

কাগজের ছাতা

মেহেরুন ইসলাম

বাইরে খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। সেই সাথে বিকট শব্দে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। প্রায় আধা ঘণ্টার মতো রোজা রেডি হয়ে বসে আছে। কিন্তু বের হতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর পর ভাবে দৌড়াতে শুরু করবে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা ভেঙে আর যেতে পারে না।

বিকট শব্দ, ঝুম, বৃষ্টি–এ সময় কোনো মা-ই তার মেয়েকে একা ছাড়তে চান না। তিনি যত জ্ঞানী বা শিক্ষিতই হন না কেন।

আস্তে আস্তে চারপাশ আরও অন্ধকার হয়ে এল। পরিবেশের অবস্থা চরম খারাপ আকার ধারণ করল। তাই শেষমেষ ডিসিশন ফাইনাল। আজ আর রোজার স্কুলে যাওয়া হবে না।

রোজা খুব মন খারাপ করেছে। পড়ালেখা যেমন–তেমন, আজ বন্ধুদের সাথে দেখা হলো না। মজার মজার খেলা, কত্ত কী সব মিস হয়ে গেল!

মামনি, মন খারাপ করো না। ইউনিফর্ম খুলে রেখে আমার কাছে এসো। আমি রান্না করব আর তোমার সাথে গল্প করব। দেখো, তোমার মন একদম ফুরফুরে হয়ে যাবে। বন্ধুদের কথা ভেবে তোমার আর মন খারাপ হবেই না। রোজা মায়ের কথায় কর্ণপাতই করল না। ইউনিফর্ম ছেড়ে সোজা রুমে চলে গেল। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। আর ডেকেও তাকে তোলা গেল না।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে এল। ১২টা ৩০-এ বৃষ্টি একটু থামল। রোজার আব্বু ব্যাংক থেকে ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বেজে যায়। আর রাফি কলেজ থেকে ২টার পরেই চলে আসে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে আজ তেমন ক্লাস না হওয়ায় আগেই ফিরেছে।

ও মা, গুড্ডুবুড়ি কই? এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি?

-ওর রুমে দেখ, শুয়ে আছে।

এখন শুয়ে আছে কেন? গোসল করেছে?

-বাবারে দয়া করে তুই একটু গিয়ে দেখ। আমার সাথে আর কথা বাড়াস না তো।

কিছুই তো বুঝলাম না। মায়ের মুখে এমন তিতা তিতা কথা কেন!!

রাফি রোজার রুমে গেল। রোজা সেইভাবেই বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।

গুড্ডুবুড়ি, গুড্ডুবুড়ি, (মাথায় হাত দিয়ে চুল নাড়তে নাড়তে) কীরে এখনও ঘুমাস কেন?

এখন কি ঘুমের সময় নাকি?

-ভাইয়া, আমার খুবই মন খারাপ (একটুখানি চোখ খুলে বলল)।

কেন রে বুড়ি?

-পরে বলব, তুমি এখন যাও।

রাফি রোজাকে জোর করে টেনে তুলল। আগে বল তো কী হয়েছে তোর?

-আজ আমি স্কুলে যেতে পারিনি (কেঁদে কেঁদে)।

আরে বোকা, তাতে কী হয়েছে?

এমন বৃষ্টির দিনে আমি তো আরও খুশি হতাম। কত সহজে স্কুল ফাঁকি দিতে পারতাম। পড়াশোনা নেই, সারাদিন কত্ত মজা করতাম।

এখানে কীসের মজা? আম্মু রান্না করবে। তার পাশে বসে বকবকানি শোনো।

-কই, এখন তো আমি আসছি। আমরা এখন ছাদে গিয়ে গোসল করব। তারপর খাবার খেয়ে সারা বিকেল গল্প করব। এবার খুশি?

-তুমি তো একটু পরেই বাইরে চলে যাবে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেবে। আমি জানি না বুঝি?

-এই তোকে ছুঁয়ে কথা দিলাম। আজ সারাদিন তোর জন্য। আমার গুড্ডুবুড়ির মন খারাপ বলে আজ আমি কোথাও যাব না। এবার একটু হাসো না...

হি হি হি হি হি... আমার ভাইয়া কত্ত ভালো!

গুড্ডুবুড়ি কি আজ পড়াশোনা করেছ?

-আব্বু, আজ তো স্কুলে যেতে পারিনি। তাই পড়াও নেই।

ইশ! বৃষ্টির জন্য তাই না?

-হ্যাঁ, আব্বু।

রাফি, তুই এখন থেকে প্রাইভেটে যাওয়ার সময় ওকে স্কুলে দিয়ে যাবি। এ সময় তো রোজ রোজ বৃষ্টি হবে। তাই বলে স্কুল তো আর মিস দেওয়া যাবে না।

হুম, আব্বু। তুমি একদম ঠিক বলেছ। কিন্তু আম্মু কিছুই বোঝে না। একটু বৃষ্টি হলেই আর স্কুলে যেতে দেয় না।

ডিনার বাদ দিয়ে সবাই রোজার কথায় হেসে উঠল। সবার হাসিতে রোজাও হাসল।

রাফির প্রাইভেট ৬:৩০-এ শুরু হয়। সেজন্য রাফি ৬টায় ঘুম থেকে উঠে রেডি হয়। কিন্তু আজকে রোজা রাফিরও আগে উঠেছে। আম্মুকেও ডাকেনি। নিজে নিজেই রেডি হয়েছে।

এই ভাইয়া, উঠো না, উঠো?

তোমার প্রাইভেটের সময় হয়েছে তো।

রাফি হুড়মুড় করে ঠেলে উঠে ঘড়ি দেখে। কেবল ৫:৩০ বাজে। রোজার প্রতি রাগ হলো তার।

এই বুড়ি, এত সকালে তোকে কে উঠতে বলেছে?

-বাহ্ রে, তোমার বুঝি মনে নেই? রাতে তো আব্বুই তোমাকে বলল আমাকে স্কুলে আগায় দিতে।

-উঁহুঁ! তাই বলে এত্ত সকালে! দিলি তো আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে। সাতসকালে আবার রেডিও! যা রুমে যা। চুপচাপ শুয়ে থাক। সময় হলে আমি ডেকে নিয়ে যাব। রোজা মন খারাপ করে রুমে ফিরে গেল। রাফি আবার শুয়ে পড়ল।

সাতটা বাজে। সবাই নাশতার টেবিলে। রাফি নেই, ওর থাকার কথাও না। কিন্তু রোজা কেন?

রোজা মামনি, তুমি রাফির সাথে যাওনি ?

-আব্বু, ভাইয়া তো এখনো ঘুমাচ্ছে।

বলিস কী! ওর তো প্রাইভেট ৬:৩০-এ।

রাফি, রাফি...

তুই এখনও ঘুমাচ্ছিস? প্রাইভেটে যে লেইট হবে, তোর কী সে খেয়াল আছে ?

-হুঁ, কয়টা বাজে আম্মু?

সাতটা বেজে গেছে।

রাফি একলাফে উঠে যায়।

উঁহুঁ! রোজার জন্য আজ লেইট। সাতসকালে আমাকে ডেকে তুলেছে।

আমি জানি তো, এমন কিছুই হবে। কাল রাতে তোমার আব্বু বলেছেন, আর সে কি মিস করতে পারে? খুশিতে তার তো রাতে ঘুমই হয়নি।

রাফি উঠে ফ্রেশ হয়ে না খেয়েই প্রাইভেটে দৌড় দেয়। আর রোজা? রোজকার মতো মায়ের সাথেই স্কুলে গেল।

আজ তার ডাবল মন খারাপ। ক্লাসে বন্ধুরা জানতে চাইলে দুইটা ঘটনাই বলল। প্রথমটা শুনে সবাই দুঃখই পেয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়টা শুনে সবাই হেসেছে আর রোজাকে খ্যাপিয়েছে। রোজা আরও রেগে মন খারাপ করল। পরে রোজার প্রিয় বন্ধু রাতুল তার মন ভালো করে দিলো। তাকে একটা কাগজের

ছাতা আর একটা নৌকা গিফট করল। রোজা কত্ত খুশি!

রাতুল এগুলো কীভাবে বানালে?

-এগুলো আমি না, কাল বিকালে আমার আপু বানিয়ে দিয়েছিল। আমি তোমার জন্য এনেছি।

-ওহ, তাহলে তো এগুলো বড়োদের কাজ।

-হ্যাঁ, রোজা তুমি ঠিক বলেছ। কাল বিকালেই আপু আমাকে বানানো শিখাতো। কিন্তু আপুর হোমওয়ার্ক, আমার হোমওয়ার্ক করতে করতে লেইট হয়ে গিয়েছিল। তাই বলেছে পরে শিখিয়ে দেবে।

-আজকে আমিও বাসায় গিয়ে আমার ভাইয়াকে বানিয়ে দিতে বলব।

-আচ্ছা, বলো। আর না পারলেও সমস্যা নেই। আমি তো আপুর কাছে শিখবই, তারপর তোমাকেও শিখাবো। কি এবার খুশি তো?

-হুম, খুব খুশি। আমার এখন আর কোনো মন খারাপ নেই।

-তাহলে এবার চলো, ক্লাসে যাই রোজা।

-গল্পে গল্পে টিফিন টাইম শেষ করলাম, কিন্তু কিছুই খেলাম না তো। দাঁড়াও, আমার ব্যাগে চকলেট আছে। রোজা রাতুলকে চকলেট দিলো এবং নিজেও নিলো।

দুজনের চকলেট খুব প্রিয়। চকলেট খেতে খেতেই ক্লাসে ঢুকল তারা ।

রোজার আর মন খারাপ নেই। খুব মনোযোগ দিয়ে, হাসিখুশিভাবেই ক্লাস করল। ঠিকমতো পড়াও বুঝে নিলো সে।

ক্লাস শেষ কিন্তু খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। রাতুলকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

কী হলো রাতুল? তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?

-না, তেমন কিছু না।

তাহলে মন খারাপ কেন?

-আসলে রোজা, আজ আমার ছাতা আনতে মনে নেই। আর আজ আপু, আম্মু একটু ব্যস্ত থাকায় কেউই আমাকে নিতে আসবে না।

এতে টেনশনের কী আছে? তুমি তো আমাকে একটি ছাতা দিয়েছ, আমি ওটা দিয়ে বাসায় যাব। আর আমারটা তোমাকে দিয়ে দেবো।

-ধুর, বোকা মেয়ে। আমি তো তোমাকে কাগজের ছাতা দিয়েছি। আর ওটা তো খেলনা ছাতা।

-তাতে কী, কোনো সমস্যা নেই। তোমার ছাতা একটুও ভিজবে না।

কীভাবে রোজা?

-রোজা হাসল, হি হি হি হি হি হি।

ওটার উপরে তো আমার আম্মুর ছাতা থাকবে।

রোজার কথা শুনে রাতুলও হাসল।■

গল্পকার

গল্প

আবিরের গাছ বন্ধু

মাসুদ রানা আশিক

আবিরের বাড়ির সামনে আছে বিরাট এক কড়ুই গাছ। ছোটো থেকেই আবির গাছটা দেখছে। অনেক মোটা একটা গাছ। গাছটা এক পায়ে কী সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। একদিন বেশ গরম পড়েছিল। আবির বাড়ি থেকে বের হয়ে গাছের নিচে তৈরি করা মাচাঙে বসে পড়ে। তারপর ভাবে, বাহ, গাছের ছায়ায় বসে থাকতে তো বেশ মজা। অনেকটা শীতল পরিবেশ। গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ শুনতে পেল আবির কেউ যেন তাকে ডাকছে, 'আবির, তুমি কেমন আছ? আমি ভালো নেই। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

তখনই আবির মাথা তুলে তাকায়। দেখে কড়ুই গাছটা কথা বলছে। অন্য কেউ হলে ভয় পেত। কিন্তু সে ভয় পেল না। সে তো জানে, গাছের জীবন আছে। সেই ছোটো থেকে গাছটাকে দেখছে সে। আবির বলল,' তুমি কথা বলতে পারো?'

গাছ বেশ ম্রিয়মাণ হয়ে বলে,' আমরা গাছেরা 'নিজেদের ভাষায় কথা বলি। যেটা মানুষ বুঝতে পারে না। মনে হলো তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে। হয়েছেও তাই। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ। জানো আবির, আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে মানুষগুলো সাইনবোর্ড টানিয়েছে। আমাদেরও তো জীবন আছে। আমাদেরও তো কষ্ট হয়। আচ্ছা আবির, তুমি বলো তো– মানুষের শরীরে যদি পিন গেঁথে কিছু লাগানো হয় তখন তাদের কষ্ট হবে না? মানুষেরা গাছের কষ্ট বোঝেই না। অথচ জানো, আমরা গাছেরা মানুষের উপকারের জন্য জীবন বিলিয়ে দেই।'

আবির পুরো গাছটার দিকে একবার নজর দিয়ে এল। বেশ কয়েক জায়গায় পিন দিয়ে স্টিলের বোর্ড টানানো হয়েছে। যেখানে পিন গাঁথা হয়েছে সেখানে কষের মতো কিছু একটা আছে। সে বুঝতে পারল এটা গাছের কান্না। তখনই সে বাড়িতে গিয়ে একটা প্লাস এনে পিনগুলো তুলে ফেলল। গাছ বলল,' জানো আবির। তুমি আমার অনেক উপকার করলে। অনেকদিন ধরে আমার গায়ে পিনগুলো গেঁথে রাখা

হয়েছিল। খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার আবির বন্ধু। তোমার সাথে আমি অনেক কথা বলব।'

আবিরও গাছের সাথে বন্ধু পাতায়। অবসর সময়ে গাছের সাথে কথা বলে সে। আবির দেখল গাছে অনেক পাখি বাসা বেঁধেছে। পাখিদের কিচিরমিচিরে মুখরিত চারপাশ। আবির তখন গাছ বন্ধুকে বলল, 'তুমি তো শুধু মানুষের বন্ধু নও। পাখিদেরও বন্ধু। দেখো, তোমার গাছের ডালে অনেক পাখি বাসা বেঁধেছে। ওদের মনের সুখের গানগুলো খুবই মধুর। ওদের বাসায় ছানারা বড়ো হচ্ছে।'

আবিরের কথা শুনে গাছ বন্ধু মুচকি হাসে। বলে,' 'আমাদের জন্মই তো উপকারের জন্য।'

আবির বইতে পড়েছে, গাছ মানুষের জন্য উপকারি -অক্সিজেন ত্যাগ করে। আর ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। আবির গাছ বন্ধুকে বলে,' তুমি তো মানুষের অনেক উপকার করো। আমরা তো অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতেই পারব না।'

'আমি মানুষের মাঝে ছায়া বিলিয়ে দেই। নির্ভেজাল বাতাস দেই আমি মানুষকে। তীব্র গরমেও মানুষের ওষ্ঠাগত প্রাণে শীতল আবহ বয়ে দেই। মাটির ক্ষয় রোধ করি।'

কিছুদিন পর হঠাৎ করে ঝড় হলো। অনেক বড়ো ঝড়। ঝড়ের আগে মাইকিং করে মানুষদের সাবধান করে দেওয়া হলো। ঝড়ের পর টিভিতে দেখানো হলো খবর। বিভিন্ন জায়গায় ঝড়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে অনেক বড়ো বড়ো গাছের কারণে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছিল। কারণ বড়ো বড়ো গাছগুলো ঝড়ের তীব্র বাতাস আটকে দিয়েছে নিজের শরীর দিয়ে। যার কারণে বসতবাড়িতে বেশি ক্ষতি হয়নি। যা ক্ষতি হয়েছে তা সেই গাছগুলোর। ডালপালা ভেঙে পড়েছিল ঝড়ে। অনেক গাছ উপড়ে পড়েছিল। ঝড়ের পর আবির ঘর থেকে বের হয়ে দেখল তাদের বাড়ির সামনের কড়ই গাছটি ঝড় সহ্য করতে না পেরে অনেকখানি হেলে পড়েছে। তবুও গাছটার মুখ অনেক হাসিখুশি। আবিরকে দেখে গাছ বন্ধু বলল,'আবির, দেখেছ আমি তোমাদের বন্ধু। তোমাদের কোনো ক্ষতি হতে দেইনি। শুধু ঝড়ের বাতাস আটকাতে গিয়ে একটু হেলে পড়েছি।' গাছটার করুণ অবস্থা দেখে চোখে পানি এসে গেল আবিরের। গাছটা এমনভাবে হেলে পড়েছিল যে-কোনো সময় গাছটা পড়ে গিয়ে ক্ষতি হতে পারে। তাই আবিরের বাবা গাছটা কাটার জন্য উদ্যোগী হলেন। তার গাছ বন্ধু কাটা পড়বে এই ভেবে আবিরের খুবই মন খারাপ হয়ে গেল।

তখন গাছ বন্ধু আবিরকে বলল,' এটাই বাস্তবতা আবির। মানুষ তার প্রয়োজনে গাছ কাটবে। গাছ কেটে নতুন আবাস তৈরি করবে। গাছ কেটে বিক্রি করে টাকা উপার্জন করবে। গাছ থেকে কাঠ হবে। সেই কাঠ দিয়ে তৈরি হবে নতুন নতুন আসবাব। সেই আসবাব দিয়ে ঘর সাজাবে মানুষ। এটা কোনো দোষের কিছু নয়। বরং এটাই নিয়ম। তুমি শুধু একটা কাজ করো। আমার ডালে অনেকগুলো পাখি বাসা বেঁধেছিল। অনেক বড়ো ঝড় হলেও ওরা বাসা ছাড়েনি। কারণ ওদের বাসায় ছানা আছে। বাবা-মায়েরা ছানাদের ছেড়ে যেতে পারে না। তোমার বাবা আমাকে কাটার আগে তুমি পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসো। অন্য কোনো গাছে তাদের বাসাটা স্থানান্তরিত করো। আর আমাকে কাটার পর নতুন করে কয়েকটা গাছ লাগিয়ে দিও। সেই ছোটো গাছগুলো এক সময় অনেক বড়ো হবে। তখন তোমাদের আবারও উপকার করবে সেই বৃক্ষগুলো। ভালো থেকো আবির।'

আবির কেঁদে ফেলল। তবে গাছ বন্ধুর কথামতো সেই গাছ থেকে পাখিদের সরিয়ে নিয়ে নিরাপদে অন্য একটা গাছে তাদের বাসাটা রেখে এল সে। তারপর বিরাট সেই কড়ুই গাছটা কাটা হলো। পরদিন সকালেই আবির তার বাবাকে নিয়ে বাজার থেকে বেশ কয়েকটা কড়ুই গাছের চারা আনল। সেগুলো কেটে ফেলা কড়ুই গাছের পাশেই রোপণ করল আবির। তারপর নিজ সন্তানের মতো পরিচর্যা করতে থাকল সে। ■

গল্পকার

বর্ষার স্মৃতি

খোরশেদ আলম নয়ন

মুছে গেছে সেই বর্ষার স্মৃতি- নেই পাল তোলা নাও
কত নদী পথ পার হয়ে গেছে- কত যে অচিন গাঁও,
পদ্মা- মেঘনা- যমুনার জল-বুক ছুঁয়ে ভালোবেসে
ভাটির দেশের মাঝি গুণ টেনে ছুটেছে উজান দেশে।

শাপলা ফোটা বিল পেরিয়ে- নাইওরি ছইয়ের তলে
স্মৃতির আঙিনা পিছু ফেলে যেত- ভেসে দুচোখের জলে,
নৌকা-বাইচ ও হা-ডুডু খেলায়- দামাল ছেলের দল
ভরা বর্ষার জোয়ারের মতো-ছিল চিরচঞ্চল।

জারি-সারি আর ভাটিয়ালি গানে-মুখরিত ছিল পাড়া
আহা সে মধুর বর্ষার রাত আজ কেড়ে নিল কারা,
পুরুষেরা যেত দূর ভিনদেশে-নারীরা নকশিকাঁথা-
বুনতে-বুনতে স্মৃতির উঠোনে-ঝরত কদম পাতা।

সোনালি আঁশের সোঁদা সেই ঘ্রাণে-ছিল যে মাটির টান
সে পাটের ছবি করেছে লোপাট-সময়ের অভিযান,
তবু আজও ফোটে কদম- কেয়া মুগ্ধ কামিনী বাসে
চির মরুময় এ দেশের বুকে তবুও বর্ষা আসে!

ইস্টিকুটুম

রাকিব আজিজ

ইস্টিকুটুম আসলে বাড়ি
যায় যে পড়ে ধূম ,
রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকে
হয় না কারো ঘূম।

কেউবা কাটে মাছের পেটি
কেউবা পুকুর ঘাটে,
কেউবা করে মোরগ জবাই
কেউবা মরিচ বাটে।

হৈহুল্লোড় সারা বাড়ি
দাদুর গলায় কাশি ,
তাইনা দেখে খোকাখুকির
মুখে মুচকি হাসি।

শান্তি যখন রাশি রাশি
হাসি খুশি সারা বাড়ি
লাল শাড়িটা পরে এসে
নাচে দাদি বুড়ি ।

রাত যখন গভীর হলো
খানাপিনা শুরু,
সব শেষে ঘুমোতে হবে
ডাকে দাদু বুড়ো।

পুতুল বিয়ে

আলম শামস

আমার বোনের ছোট্ট পুতুল
নামটি হলো বেলা
রোজ বিকেলে তাকে নিয়ে
করতে থাকে খেলা।

সোমবারে তার বিয়ে হবে
দাওয়াত দিলো মাকে
মা যাবে তার বিয়ে খেতে
সঙ্গে নিবে কাকে?

নজরানা সে দিবে গাড়ি
আরো দিবে শাড়ি
বিয়ে খেতে গিয়ে দেখে
জামাই তো নেই বাড়ি।

● মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস ধারাবাহিক

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূব প্রকাশিতের পর দশম পর্ব-২য় অংশ]

মাস্টার সাহেব জমির ভাইয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন– তাদের আগেই তোমরা আসবা। আর যদি তারা আগে এসেই পড়ে তো যে ক্ষতি তারা করতে পারবে, তার পরিমাণ খুবই সামান্য। আমাদের কাছে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান– কোনো কিছুর সাথেই তার তুলনা হয় না। তুমি চিন্তা করো না বাবা। তোমরা আজ রাতের মধ্যেই এখান থেকে মেহগনি বাগানে চলে যাবে। আমরা তিন গ্রামের মানুষদের দূরের গ্রামে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শেষ করব রাত বারোটা-একটার মধ্যেই। তারপর সকালে 'ওদের বিশ্বস্ত ইনফরমার' কাদের আলি রাজাকার ক্যাম্পে গিয়ে খবর দেবে যে, মুক্তি লোক সব ভাগ গিয়া। তারপর জমবে আসল খেলা।

জমির ভাই আরেকবার মাস্টার সাহেবের সাথে কোলাকুলি করলেন। তারপর তাকে বিদায় দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সময়মতো প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

রাত সাড়ে এগারোটায় মুক্তিযোদ্ধাদের পুরো দলটি অদূরে শেখদের মেহগনি বাগানের দিকে রওনা হলো। আকাশে তখন চাঁদ নেই। শুধু অসংখ্য তারা মিটিমিটি হাসছে যেন বাংলার বীর সন্তানদের দিকে তাকিয়ে। তাদের খুশি আর প্রাণভরা আশিস যেন আকাশের নীল সমুদ্র থেকে সহস্র ধারায় ঝরে পড়ছে মুক্তিযোদ্ধাদের মাথার ওপর এবং সারা শরীরে।

এদিকে মাস্টার সাহেবের নেতৃত্বে 'মুক্তিযোদ্ধা সাহায্য কমিটির সদস্যরা ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাম তিনটির লোকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলার কাজ শেষ করলেন রাত একটার মধ্যেই।

পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক রাত ঠিক সাড়ে তিনটায় আমাদের যৌথবাহিনী রায়পুর রাজাকার ক্যাম্পে হামলা চালায়। রাজাকারেরাও প্রস্তুত ছিল। কারণ, কয়েকদিন থেকেই ওরা নাকি ক্যাম্পে বড়ো ধরনের হামলার আশঙ্কা করছিল। তাই ক্যাম্পে বেশ কয়েকজন পাকি আর্মিও এসেছিল শহর থেকে। ফলে তারা বেশ জোশেই ছিল। তুমুল গোলাগুলি শুরু

হলো, কিন্তু তা চলল মাত্র পনেরো মিনিট। তারপরই আমরা চুপ। আস্তে আস্তে ক্রলিং করে পেছনে সরতে থাকি আগের প্ল্যান মতোই। ওরা আরো কিছুক্ষণ ফায়ার চালু রাখল, তারপর প্রতিপক্ষের আর কোনো সাড়া না পেয়ে ওরাও গুলি বন্ধ করে। আমরাও কিছুক্ষণের মধ্যে মেহগনি বাগানে পৌছে গেলাম ডামি অপারেশন শেষ করে।

মাস্টার সাহেবের প্ল্যান মতো পরদিন ভোরেই ইনফরমার কাদের আলি ছুটে যায় রায়পুর রাজাকার ক্যাম্পে। সে খুশিতে নাচতে নাচতে ঘোষণা করে– মুক্তিরা পলাইছে। মুক্তিরা পলাইছে। এক রাতের মধ্যেই হাওয়া।। হা হা...

কাদেরের চিৎকার শুনে ছুটে আসে রাজাকার কমান্ডার আইনুদ্দিন মিয়া। কাদের তাকে জড়িয়ে ধরে বলে– কমান্ডার সাব, আপনার কাছে কি ভয়ের জাদু আছে? সেই ভয়ের জাদুর ভয়েই কি মুক্তিরা রাতারাতি পলাল? এখন কই যাবে জয়বাংলাঅলারা? খুব তো এতদিন মুক্তিগের খাওয়াল, কত সাহায্য করল। অহন কনে যাবানে বাছাধনেরা? অহন রাজাকারের বীর মুজাহিদরা তোমাগের খতম করবেনে আর তোমাগের গরু-বাছুর, ধান-চাল, সোনাদানা লুটে আনবেনে। তহন কী করবানে? কমান্ডার ছার, ঝাঁপায়ে পড়েন। ঝাঁপায়ে পড়েন...

কাদেরের হাউকাউ যেন আর থামতেই চায় না। তার কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের 'পালিয়ে যাওয়ার' খবর পেয়ে কমান্ডার আইনুদ্দিন আর অন্য রাজকারদের মধ্যে খুশির হুল্লোড় পড়ে যায়। গতকাল শহর থেকে আসা কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য ঝিম মেরে পড়ে ছিল বারান্দায়। তারা চোখ মেলে তাকিয়ে বলে– কেয়া হুয়া! কুছ গলতি হুয়া!–কী হয়েছে! কোনো সমস্যা!

রাজাকার কমান্ডার আইনুদ্দিন হাসতে হাসতে বলে– নেহি নেহি খান ছাবরা, কোনো গলতি হয় নেহি। বহুত খুশির খবর হ্যায়, বহুত খুশির খবর। মুক্তিরা এই এলাকা ছেড়ে ভাগ গিয়া হ্যায়। ব্যাটারা ভয় পায়া হ্যায়। আপ লোক ক্যাম্পে আয়া, তাই মুক্তি লোক ভয় পায়া ভাগ গিয়া হ্যায়।

আর্মিগুলো এবার সোজা হয়ে বসে। ওদের মধ্য থেকে একজন বলে– হাঁ হাঁ, বহুত খোশ খবর হ্যায়। বহুত খোশ খবর। ইয়ে ভাই কমান্ডার সাব, মুক্তি লোগ ভাগ গিয়া তো খেল খতম হো গিয়া। আভি হাম লোগ কিসকা সাথ ফাইট করেগা ভাই?– এখন আমরা কাদের সাথে যুদ্ধ করব?

কমান্ডার এবার খুশিতে গদ গদ হয়ে বলে–আপ লোকের আর কষ্ট নেহি হোগা হ্যায়। আপ লোক ভালো করে খানাপিনা করেন হ্যায়, আরাম করেন। তারপর বিকেলে শহরে চলে যাবেন হ্যায়। এহন হাম লোক গ্রামকা নয়া মুক্তিগের ঘর মে ঘুঘু চরায়ে ছাড়েগা হ্যায়। আমরা তাগের সবগুলোরে জয় বাংলা মে পাঠায়ে দেবো হ্যায়।

ছদ্মবেশী ইনফরমার কাদের আলি হানাদারদের পা-চাটা গোলাম আইনুদ্দিন কমান্ডারের কথা শোনে আর ভেতরে ভেতরে রাগে জ্বলতে থাকে। তার মনে হতে থাকে– এখনি বেইমানটার গলা টিপে ধরে তাকে শেষ করে দেয়। কিন্তু বাইরে কাউকেই কিছু বুঝতে দেয় না সে। সে জানে, মুক্তিযুদ্ধ তাদের সামনে এক বিশাল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় জিততে গেলে ধৈর্য ধরে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

এতক্ষণ ভুলভাল উর্দু-বাংলা মেশানো খিচুড়ি ভাষায় আর্মি কজনের উদ্দেশে বকবক করতে করতে কমান্ডার আইনুদ্দিন তাদের 'বিশ্বস্ত ইনফরমার' কাদের আলির কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল। এবার সে কাদের আলির কাছে এসে তার হাত ধরে নিচু স্বরে বলে– সরি ভাই কাদের। অনেক সরি। আসলে তুমি তো আমাগের নিজেরই লোক। ওই ব্যাটারা এট্টু মাথা মোটা তো, তাই খানিকটা অয়েলিং করে দিলাম। তা ভাই, আসো– বসো। এই কে আছ, চা-মিষ্টি আনো। কাদের মিয়া এত বড়ো একটা খুশির খবর আনল, যা হিমালয় পাহাড়ের মতো উঁচু। ওর জন্য ইস্পিশাল খাবার চাই।

কাদের হাত উঁচু করে আইনুদ্দিনকে থামায়, বলে– কমান্ডার সাব, এখন না, পরে। চা-মিষ্টি নয়। বিশাল ভোজ হবে। আজ মানুষের বাড়ি থেকে যে ধান-চাল-ডাল আর গরু-খাসি পাওয়া যাবেনে তা

দিয়েই ভোজ হবে। এহন তাই এই চা-মিষ্টিতে মুখ নষ্ট কত্তি চাচ্ছিনে। তাছাড়া, ওদিকের খোঁজখবর রাখতি হবে না? কহন কী ঘটে, সব খবর তো আপনাগের জানাতি হবে, তাই না?– বলেই কাদের দ্রুত ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যায়। তার দিকে তাকিয়ে রাজাকার কমান্ডার আইনুদ্দিন বিড়বিড় করে বলে– শাবাস বেটা, শাবাস!

কাদের চলে যাওয়ার পর আইনুদ্দিন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও রাজাকার বাহিনীর অন্য হোমরাচোমরাদের নিয়ে মিটিংয়ে বসে। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো– সন্ধের আগে-আগেই তারা বেরিয়ে পড়বে, যাতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলেই কাজ শুরু করা যায়। এসব কাজ একটু অন্ধকারেই মানায় ভালো– অভিমত হোমরাচোমরাদের। আজকের টার্গেট হবে কাছের তিনটি গ্রাম। প্রথম দিন বেশি দূরে যাওয়া যাবে না। বিচ্ছু মুক্তিদের বিশ্বাস নেই– কখন এসে বাজের মতো ছোঁ মেরে বসে তার কী ঠিকঠিকানা আছে! ঠিক হলো– মুক্তিযোদ্ধাদের সাপোর্টারদের বাড়িগুলোয় রেইড দিয়ে সেখানে যাদের পাওয়া যাবে, তাদের গুলি করে সেখানেই খতম করা হবে। সেসব বাড়ি থেকে লুট করা তথাকথিত 'গনিমতের মালামাল' আনার জন্য ওদের সাথে তিনটি বড়ো ট্রাক নেওয়া হবে। মালামাল ট্রাকে তোলার পর সেসব বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। আরো সিদ্ধান্ত হলো– শহর থেকে আসা খান সেনারা বিকেলে ফিরে যাবে। অপারেশনে অংশ নেবে দুটো গ্রুপে মোট দুশো রাজাকার। এদের মধ্যে একশ জন 'শত্রুবাড়ি' রেইড দিয়ে 'মুক্তির চরদের' খতম, মালামাল ট্রাকে ওঠানো আর বাড়িঘরে আগুন লাগানোর দায়িত্ব পালন করবে। বাকি একশ জন থাকবে নিরাপত্তা পাহারায়, যাতে হঠাৎ করে কেউ তাদের ওপর হামলা করলে তার মোকাবেলা করা যায়। এছাড়া ক্যাম্পের অন্য রাজাকারদের সতর্ক করে দেওয়া হলো– অবস্থা বুঝে তারাও যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেডি থাকে।

মিটিং শেষ হলে রাজাকারেরা যার যার জায়গায় চলে যায়। সবার মধ্যে যেন একটা গা-ছাড়া ভাব– মুক্তিরা যখন এলাকা ছেড়ে পালিয়েই গেছে, তখন তারা আর এদিকে আসতে সাহস করবে না। তাই কেউ ক্যারম, কেউ লুডু খেলায় লেগে গেল। কেউ কেউ আবার পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত গাইতে থাকে বেসুরো গলায়: পাক সার জামিন শাদ বাদ/কিশওয়ারে হাসিন শাদ বাদ।

আর ইনফরমার কাদের আলি কী করল? সে দ্রুত ছুটে যায় মাস্টার সাহেবের কাছে। মাস্টার সাহেব সব জানালেন তার লোকদের। তিনি তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। সিদ্দিক, মতিন আর খসরু– এই তিন কিশোরকে বললেন– তোমরা তিনজন একটু দূরে দূরে থেকে রাজাকারদের গতিবিধি লক্ষ করবে, আর রহমান, মনির, খলিল, ইবরাহিম ও শিপনের কাছে খবর দেবে। তারাও কিছুটা দূরে দূরে থাকবে– এটা-সেটা কাজ করার ভান করবে। তোমরা লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে লাটিম খেলবে বা গুলতি ছুড়বে বা ঘোরাঘুরি করবে। তবে রাজাকার ক্যাম্পের কাছাকাছি যাবে না, ওদের চোখের আড়ালে থেকেই সব দিকে লক্ষ রাখতে হবে। রাজাকারেরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এলেই একজন পরেরজনকে খবর দেবে। এভাবেই রহমান, মনির, খলিল, ইবরাহিম ও শিপনরা খবর পেয়ে যাবে। তারাও একইভাবে খবর পাস করে দেবে– যেন চমৎকার এক খবরের চেইন। কারও কথা বলার দরকার নেই, শুধু খেলাচ্ছলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ইশারা করবে। এভাবেই খবর পৌঁছে যাবে মেহগনি বাগানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। মাত্র তো আধ মাইলের পথ। খুব বেশি সময় লাগবে না। আমি এবং আমাদের সংগঠনের অন্য সদস্যরা আগেই আলাদা আলাদাভাবে যার যার মতো মেহগনি বাগানে পৌঁছে যাব। তোমরা খুব সাবধান। রাজাকারেরা যেন কিছুই বুঝতে না পারে।

মাস্টার সাহেব, ইনফরমার কাদের আলি এবং 'মুক্তিযোদ্ধা সাহায্য কমিটি'র অন্য সব সদস্য সন্ধের সাথে সাথে মেহগনি বাগানে পৌঁছে যান। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। মাস্টার সাহেবরা পৌঁছনোর পরপরই জমির ভাইয়ের কমান্ডে মুক্তিযোদ্ধারা রওনা দেয় তাদের টার্গেটের উদ্দেশে।

নভেম্বরের কুয়াশা সন্ধের অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে দিয়েছে। তাতে বরং সুবিধেই হলো, দূর থেকে মাঠের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাস্টার সাহেব আর তার দলের সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে পেছনে চললেন। মাস্টার সাহেবের হাতে একটা এসএমজি। অন্যদের কারো হাতে ৩০৩-রাইফেল, কারো হাতে শুধু গজারি-ডালের লাঠি।

রাজাকারেরা গ্রামে পৌঁছার আগেই মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে পৌঁছে গেল। এরপরই এলেন মাস্টার সাহেব ও তার সঙ্গীরা। জমির ভাইয়ের নির্দেশে সত্তর জন মুক্তিযোদ্ধা পরিত্যক্ত ঘরগুলোতে সুবিধাজনক জায়গায় দ্রুত পজিশন নিল। বেশ কয়েকটি পাকাবাড়ির জানালা বরাবর ফিট করা হলো তিনটে মেশিনগান ও পাঁচটা এলএমজি। চাইনিজ রাইফেল, এসএমজি, গ্রেনেড এসব অস্ত্র নিয়েও মোটামুটি সুরক্ষিত জায়গায় পজিশন নিল অন্যরা। ঘরের ধান-চালের বস্তাগুলো ওদের খুবই কাজে লাগল নিরাপত্তা-শেল্টার তৈরির জন্য। জমির ভাই আর মাস্টার সাহেব কাঁধে এসএমজি ঝুলিয়ে সবকিছু তদারক করছেন।

হঠাৎ কিছু দূরে ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই তিনটে ট্রাক এসে থামল রাস্তার কাছাকাছি বাড়িগুলোকে সামনে রেখে। এখানে তিনটেই সেমি-পাকা বাড়ি– ইটের দেওয়াল আর টিনের ছাউনি। বাড়িগুলোর মালিকেরা যে ধনী, তা বাড়ির চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এসব বাড়িতে যে অনেক মালসম্পদ থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! তাছাড়া বাড়ি তিনটির মালিক ফরিদ শেখ, মজিদ বকশ আর হাতেম শেখ হলো কাট্টা জয় বাংলাঅলা। সুতরাং তাদের বাড়ি থেকেই 'শুভকাজ' শুরু করতে চায় তারা।

অল্পক্ষণ পর রাজাকার কমান্ডার আইনুদ্দিন ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান রহিম গাজি একটা জিপ থেকে নামে। আইনুদ্দিন নিজেই ড্রাইভ করেছে। অন্য রাজাকারদেরও দেখা যায় ট্রাক থেকে নামতে। বাকিরা হয়ত হেঁটে আসছে বলে এখনো এসে পৌঁছেনি। জিপ থেকে নেমেই আইনুদ্দিন ও রহিম গাজি আঙুল উঁচিয়ে নানা রকম নির্দেশ দিতে থাকে রাজাকাদের। নির্দেশ পেয়ে রাজাকারেরা বেশ কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন বাড়ির দিকে যেতে থাকে। একটু পরে অন্য রাজাকারেরাও এসে হাজির হলো। তারাও কমান্ডারের নির্দেশমতো যার যার দায়িত্ব পালন করতে যায়।

কিন্তু হঠাৎ এ কী! কিসের শব্দ এসব! মেশিনগান, এলএমজি,

রাইফেল আর গ্রেনেডের কান-ফাটানো গর্জন কোথা থেকে এল! আকাশে তো মেঘ নেই, বাজ পড়ার শব্দও তো আসার কথা নয়! তবে! তাহলে...

কিন্তু আর চিন্তা করার সময় পায় না রাজাকার কমান্ডার আইনুদ্দিন আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। বিভিন্ন বাড়ির নিরাপদ পজিশন থেকে বৃষ্টির মতো গোলাগুলি চালিয়ে যেতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। কয়েকজন রাজাকার কিছুক্ষণ পালটা ফায়ারিং চালিয়ে গেল, কিন্তু তাতে কোনো সুবিধে হলো না। গেরস্তের ঘরগুলোর ইট কাঠ বা টিনের বেড়া আর ঘরের মধ্যে রাখা ধান-চালের বড়ো বড়ো বস্তা শক্ত ব্যারিকেডের কাজ করল। বিভিন্ন পজিশন থেকে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি এসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় সব রাজাকারকে নিকেশ করে দিলো। কমান্ডার আইনুদ্দিন ও রহিম গাজিকে দেখা গেল– ওরা গুলি খেয়ে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে মুহূর্তে নিথর হয়ে গেল। অন্যদের লাশও এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। হিসাব করে দেখা গেল, লাশের সংখ্যা সর্বমোট ১৯৩টি। বাকি কয়েকজন কীভাবে যে পালিয়ে গেল, তা বোঝা গেল না। বড়োই দুঃখের বিষয়, এ যুদ্ধে আমাদের পক্ষের দুজন আহত হলো। এরমধ্যে একজন স্বয়ং কমান্ডার জমির ভাই। তার মাথার একপাশে গুলি লেগেছে; তবে গুলি কপালের বাঁ দিকের চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে গেছে, বেশি ভেতরে ঢুকতে পারেনি বলে রক্ষে। বেশ রক্তপাত হয়েছে। সাথে সাথে ব্যান্ডেজ করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই, তবে দিন পনেরো বিশ্রামে থাকতে হবে তাকে। আহত অন্যজন হলো দিয়াড়ার আতিক– রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীরই সাহসী যোদ্ধা। তার পায়ে গুলি লেগেছে। আমাদের সাথে থাকা ডাক্তার তাকেও চিকিৎসা দিয়েছেন, সেও আশঙ্কামুক্ত; তবে তাকেও দিন সাতেক বিশ্রামে থাকতে হবে।

এই যুদ্ধের সময় জমির ভাইয়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী লায়নের সাহস আর বীরত্বের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। তার জন্যই আমি শত্রুর গুলি থেকে প্রাণে বেঁচে যাই। আমি নিজের চোখে দেখেছি সে-দৃশ্য। আমি আর জমির ভাই যখন পনেরো/বিশ হাত ব্যবধানে নিজ নিজ পজিশন থেকে এলএমজি চালাচ্ছি রাজাকারদের দিকে, তখন আচমকা লায়ন ছুটে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। আমি মাথা নিচু করে কাত হয়ে একপাশে পড়ে যাই। সেই মুহূর্তেই শত্রুর একটি বুলেট আমার পেছনের দেয়ালে বিদ্ধ হয়, কাত হয়ে পড়ে না গেলে যা নির্ঘাৎ আমার মাথায় লাগত। আমি তখনো কাত হয়ে আছি। কিন্তু লায়ন কই? তাকে তো দেখছি না! একটু পরে কারো ভয়াবহ আর্তচিৎকারে আমি কেঁপে উঠি– জমির ভাইয়ের কিছু হয়নি তো! চার/পাঁচ হাত দূরে তাকিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমি খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম এবং যথাযথ পজিশনে স্থিত হলাম। দেখি– লায়ন রাইফেলধারী এক রাজাকারের ওপর চড়াও হয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, রাইফেলটা পড়ে রয়েছে পাশে। লায়ন তার ধারালো দাঁত বসিয়ে দিয়েছে রাজাকারটার কণ্ঠনালিতে। গলগল করে রক্ত ঝরে পড়ছে আর অসহায় রাজাকারটা কাটা-মুরগির মতো ছটফট করছে। খানিক বাদেই তার দেহ নিথর হয়ে গেল। এদিকে শত্রুর গোলাগুলিও থেমে গেছে। লায়ন এক লাফে আমার কাছে এসে আমার গায়ে লেজ বুলিয়ে তখনি চলে যায় জমির ভাইয়ের পজিশনের দিকে। আর অনবরত ঘেউঘেউ শব্দে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দেয়। তার কণ্ঠে স্পষ্ট বিপদের আভাস। আমি দ্রুত এগিয়ে দেখি ততক্ষণে জমির ভাই গুলি খেয়ে পড়ে গেছেন। এবার লায়নের গলায় ঘেউঘেউয়ের পরিবর্তে সে কি কান্না আর গড়াগড়ি! তা দেখে আমরা কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি।

যাহোক, যুদ্ধের মূল অংশ শেষ হলো। যুদ্ধ শেষে মাস্টার সাহেব, আমি এবং অন্যরা জমির ভাই ও আতিকের চিকিৎসা ও রায়পুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের বিষয়ে আলোচনা করছি। জমির ভাই আর আতিককে মেহগনি বাগানে ডাক্তারের কেয়ারে পাঠানো হলো তখনি। এদের জন্য আমাদের মন ভেঙে গেছে, তবুও রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত আমরা বাতিল করি না। মাস্টার সাহেব সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে পুরো বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে মনোনীত করলেন। এখনি ক্যাম্প আক্রমণে যেতে হবে, না-হলে শত্রুরা আরো শক্তি বৃদ্ধি করার

সুযোগ পাবে। আমি সবাইকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেবো, এমন সময় একটু দূরেই কার যেন গলা শোনা গেল। কে যেন ভাঙা-ভাঙা গলায় বলছে– কই, আমার বাজান কই? কই আমার জমির বাজান? ওর জন্যি আমি বাগুনপোড়া আর ভাত নিয়ে আইছি। আয় বাজান খাবি আয়।–বলতে বলতে এক থুত্থুরে বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে বেশ জোরের সাথে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। তার সাথে বারো/তেরো বছরের এক কিশোর, তার এক হাতে একটা টিনের প্লেট আরেকটি প্লেট দিয়ে ঢাকা দেওয়া। অন্য হাতে জগ ভর্তি পানি আর একটা পুরনো টিনের গ্লাস।

বুড়িকে দেখেই আমি তার দিকে এগিয়ে যাই। তার সম্পর্কে আগেই শুনেছি, তাই তার হাত ধরে বলি– মা, জমির ভাই তো এখন এখানে নেই। অন্য জায়গায় আছে। আপনি খাবারটা আমার কাছে দিয়ে যান, আমরা তার কাছে পৌঁছে দেবো।

আমার একথা শুনে বুড়িমা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যান। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবেন, তারপর চিন্তিত গলায় বলেন– না রে বাপ, আমার মনের মদ্দি ভালো ঠেকতিছে না। তোরা সত্যি করে ক' তো কী হয়ছে আমার বাজানের? মিথ্যে বলবি না। সে একজন মুক্তিযুদ্ধা, এই দ্যাশের সোনার ছাওয়াল। তার সম্বন্ধে মিথ্যে বলা পাপ। তোরা শুধু এইটুক বল যে সে বাঁইচে আছে।– বলতে বলতে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন বুড়িমা।

আমি বুড়িমার হাত ধরে বলি– মা! আপনার ছেলে বেঁচে আছে। সে যুদ্ধে সামান্য আহত হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। অল্প দিনেই ভালো হয়ে যাবে। তখন তার সাথে দেখা করতে পারবেন, এখন একটু দূরে আছে। আপনি খাবার রেখে বাড়ি যান। কাউকে কিচ্ছু বলবেন না এ সম্পর্কে।

আমার কথায় বুড়িমা শান্ত হন। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছেন। তারপর খাবারের থালা আর জগ গ্লাস রেখে আস্তে আস্তে বাড়ির পথ ধরেন।

এদিকে নলডাঙ্গার শেখপাড়ায় রাজাকারদের ওপর ভয়ঙ্কর গজবের খবর পেয়ে রায়পুর রাজাকার ক্যাম্পের অবশিষ্ট চল্লিশ রাজাকার বিলম্ব না করেই পালিয়ে যায় উত্তর দিকে। রাতে ওদের ক্যাম্পে বাতি জ্বালানোর মতোও কেউ রইল না আর। এই এলাকায় তারা আর কখনো ফিরে আসেনি। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরাও এত ডাউনে অপারেশনের ঝুঁকি নেয়নি আর।■ *[চলবে...]*

শিশু সাহিত্যিক

আদ্রিতা খানম নিহাল
৩য় শ্রেণি, বোয়ালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

মানুষ সত্য

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

সিলেটের অবস্থা ভয়াবহ
ডুবছে সব অহরহ।
বাঁচার জন্য ছাড়তে হচ্ছে
পূর্ব পুরুষের ভিটের মোহ।

এই দূযোর্গের মাধ্যমেই
দেশ কিছু রত্ন পেল।
প্রতিটি ঘর আলোকিত করল
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো।

সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে,
এসব মুক্তার জন্ম হোক
বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে।

কবি বলেছেন তাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

অষ্টম শ্রেণি, বিএ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

স্বপ্ন

মাহির আহমেদ

স্বপ্নগুলো জমা রাখি
মনের খামের ভাঁজে
আচমকা স্বপ্ন দেখি
নানা রকম কাজের মাঝে।

স্বপ্ন দেখি হবো আমি
নতুন ভোরের পাখি
যার মধুর কণ্ঠ শুনে
খুলবে সবার আঁখি।

এত রঙের স্বপ্ন আমার
হবে যে করতে পূরণ
কারণ আমি অনেক স্বাধীন
কোথাও নেই কোনো বারণ।

৯ম শ্রেণি, কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা

ইঁদুর

আরিবা ইবনাত

মাঠে ফসল পাকে যখন
ইঁদুর বানায় ক্ষেতে ঘর
ফসল কেটে নিয়ে জমায়
গর্তের ভিতর।

জোগায় তারা নিজের খাবার
পাকা ফসল কেটে
কৃষকের ফলানো ধান
খুট কুট করে ভরে পেটে।

৮ম শ্রেণি, মোড়লগঞ্জ মডেল
সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগেরহাট

বর্ষা

শাহনেওয়াজ বাপ্পী

বর্ষা মানে মেঘলা আকাশ
টাপুরটুপুর বৃষ্টি
সাত রঙের ভেলায় ভেসে
রংধনুর সৃষ্টি।

বর্ষা মানে খালে-বিলে
পানি করে থই থই
খাকা খুকু দলবেঁধে
করছে হইচই

বর্ষা মানে হালকা হাওয়ায়
কদম ফুলের গন্ধ
গুন গুন করে গাই
গান -কবিতার ছন্দ।

১০ম শ্রেণি, কদমতলা হাই স্কুল বাসাবো

বুলবুলি ও দুষ্টু ছানা

রকিয়া জান্নাত রুমা

এক গাছে এক বাসা ছিল। সেই গাছে বুলবুল ও বুলবুলি পাখি বাস করত। সুন্দরভাবে তাদের সংসার চলে। একদিন দুপুরবেলা খাবারের খোঁজে বের হয় বুলবুল পাখি, ফিরে এসে দেখে সবকিছু এলোমেলো ও এবড়োখেবড়ো আর এদিকে বুলবুলি পাখি ঘুমিয়ে আছে। তা দেখে বুলবুল পাখি রেগে আগুন হয়ে যায়। খুব সোরগোল করতে থাকে, বুলবুলি পাখির ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলতেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রয়! পাতায় রাখা খাবারগুলো এমন কে করল? খুব বকাঝকা করে বুলবুল পাখি। বুঝতেই চায় না যে এটা বুলবুলির কাজ নয়। এখানে কিছু ঘটে ছিল! পরে বুলবুলি পাখি বিষয়টা অনুসন্ধান করে দেখে যে, নিচ থেকে দস্যি ছেলেরা ঢিল মেরে বাসা ভাঙতে চেষ্টা করছিল। ভাঙতে পারেনি, শুধু ঢিলের হালকা আঘাত লেগেছে। আর খাবারগুলো এভাবে এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। বুলবুলি পাখি ঘটনাটি পরে বুঝতে পারে। কিন্তু ভয়ে বুলবুল পাখিকে সব খুলে কিছু বলেনি । ঠিকই কিছুক্ষণ পর লক্ষ করে কেউ ঢিল ছুঁড়ছে। বুলবুল ও বুলবুলি পাখি খুবই কষ্ট পেল। কী অপরাধ করেছি? আমাদের বাসা ভেঙে দিতে

চায়। আকাশের দিকে দুজনে চেয়ে থাকে আর আকাশের মালিককে সবকিছু বলে। বুলবুল ও বুলবুলি পাখি সেখান থেকে দূরে নবগ্রামে চলে যায়। সেখানে কাঁঠাল গাছে বাসা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে বুলবুলি পাখির ডিম পাড়ার সময় হয়ে আসছে। দুজনে খুব কষ্ট করে খড়কুটো ও গাছের পাতা দিয়ে নতুন করে বাসা তৈরি করে। পরের দিন সকালে বুলবুলি পাখি একটি ডিম পাড়ে। কয়েকদিন পর ডিম থেকে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা বের হয়। তা দেখে বুলবুল ও বুলবুলি পাখি আনন্দে নেচে উঠে। চারদিকে আগমনী বার্তার প্রেরণার সুর বাজে। আশপাশের সকলকে মিষ্টিমুখ করায়। অনেক পাখি দেখতে আসে, অনেকে অনেক কিছু নিয়ে আসে। ছোট্ট দুটো ছানা আড়ালে রাখে। কেউ এলে কিচিরমিচির শুরু করে দেয়।

কারো কোলে থাকতে চায় না, শুধু কিচিরমিচির করে, মায়ের কোল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কোল। যে কোল জুড়ে রয়েছে মায়া ও মমতার গভীরতা। ছানা দুটো বড়ো হলো। একটু উড়তে শিখেছে, কিন্তু বেশিক্ষণ উড়তে পারে না, পড়ে যায়। বুলবুল ও বুলবুলি পাখির অনেক বড়ো স্বপ্ন ছোট্ট দুটো ফুটফুটে ছানাদের নিয়ে।

হঠাৎ একদিন সকালে লক্ষ করে কাঁঠাল গাছ বেয়ে এক হুলোবিড়াল উঠছে। তাকে দেখে বুলবুল ও বুলবুলি পাখি ভয়ে অর্ধেক হয়ে যায়। হুলোবিড়ালটি ডাল পর্যন্ত আসে আর উপরে উঠে না, শুধু চোখে চোখে তাকায়। বুলবুল ও বুলবুলি পাখি খুব ভাবনায় পড়ে গেল, এতদিন মানুষ আমাদের ক্ষতি করল। এখন প্রাণী হয়ে অন্য প্রাণীদের ক্ষতি করবে। সবাই স্বভাবজাত প্রাণী হয়ে উঠছে। জোর যার মুলুক তার, আজ আমরা দুর্বল ব'লে বারবার আক্রমণের শিকার হচ্ছে, কিন্তু এভাবেই কি এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বাসা করা, এটাই কি সমাধান? মনে মনে বুলবুল পাখি ভাবছে আর আফসোস করছে! কোনো হিসেব মেলাতে পারছে না।

বুলবুল ও বুলবুলি পাখি সতর্ক হয়ে থাকে। প্রায় হুলোবিড়ালটি সে ডাল পর্যন্ত আসে আর উপরে আসে না। এভাবেই দুইদিন পার হয়ে গেল। ঘরে খাবার নেই। খাবারের সন্ধানে বের হবে। হুলোবিড়ালের ভয়ে বের হতেও পারছে না। পেটের ক্ষুধা অসহনীয়, বের না হলে কী খাবে? দুজনকেই যেতে হবে। অবশিষ্ট কিছু নেই। পরিপাটি ঘরটি বন্ধ করে দুজনে খাবার আহরণে বের হয়। দুপুর হয়ে এল ফিরে আসার নামকথা নেই। ক্ষুধার্ত ছানাদুটো, ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দরজা খোলে বের হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এডাল হতে ওডাল হয়। নিচ ডালে হুলোবিড়ালকে দেখে ছানাদুটো কান্না শুরু করে দেয়। আকাশের অবস্থা ভালো না দ্রুত মেঘে ঢেকে যায়। প্রচণ্ড বেগ নিয়ে বাতাস বহে। বাতসের বেগ সহনীয় ছিল না। মুহূর্তে বাতাস থেমে গেল। টুপটুপ বৃষ্টি পড়ে আকাশটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। ঝলমলে রোদের দেখা মিলল। তার কিছুক্ষণ পরই বুলবুল ও বুলবুলি পাখি খাবার নিয়ে হাজির। বাসা দেখে খোলা আর নিচের ডালে হুলোবিড়াল। বাসার ভিতর ছানাদুটোকে না পেয়ে উচ্চস্বরে কান্না শুরু করে দেয়। বুলবুল ও বুলবুলি পাখি অনেক খোঁজাখুঁজির পর, না পেয়ে হুলোবিড়ালকে সন্দেহ করে। হুলোবিড়াল তাদের দুটো ফুটফুটে সুন্দর ছানাকে খেয়ে ফেলেছে। হুলোবিড়াল সাথে সাথে অস্বীকার করে।

বুলবুল ও বুলবুলি পাখি বলল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

হুলোবিড়াল - না না কেন মিথ্যে কথা বলব।

আমাদের জাতভেদে পৃথক হতে পারি কিন্তু তোমাদের এত বড়ো সর্বনাশ করতে পারি না, সবাই একই রকম হয় না, কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না।

বুলবুল পাখি-তাহলে তুমি রোজ নিচ ডালে আসো কেন?

হুলোবিড়াল- কী বলব কষ্টের কথা আমার বাচ্চা নেই! ছানাদুটোকে দেখতে আসি, তোমরা থাকো তাই নিচের ডাল পর্যন্তই আসি, আর উপরে আসি না, আমার খুব মায়া হয়। তাদের মুগ্ধকর কিচিরমিচির ডাক আমাকে নিয়ে আসে!

এরই মাঝে ছানা দুটোর চরম ভয়ার্ত কিচিরমিচির কণ্ঠ কানে ভেসে আসে। সাথে সাথেই বুলবুল ও বুলবুলি পাখি এদিক ওদিক খুঁজতে শুরু করে। এতে হুলোবিড়ালও যোগ দেয়। অবশেষে খুঁজে পেল এক ঝোপের নিচে। কিন্তু ছোটো ছানাটির পা ভেঙে গেছে। ছানাদুটো উপরে নিয়ে আসা হলো। এরপর সবকিছু খুলে বলল তাদের সাথে কী ঘটেছিল ?

এই ঘটনার জন্য বুলবুলও বুলবুলি পাখি নিজকে দায়ী করে, হয়ত একজন বাসায় রয়ে গেলে এত বড়ো সর্বনাশ হতো না, আর হুলোবিড়ালের প্রতি বুলবুল ও বুলবুলি পাখির শ্রদ্ধা বেড়েই চলছে।■

৭ম শ্রেণি, উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
গোদাগাড়ী,রাজশাহী

বিশ্ব বাঘ দিবস

শাহানা আফরোজ

বন্ধুরা, চিড়িয়াখানায় গেলে কোন পশুটা দেখার জন্য সবচেয়ে আগে দৌড় দাও বলো তো । হ্যাঁ ঠিক বলেছ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার তাই না। শরীরের ডোরাকাটা দাগ, কান ফাটা গর্জন, চালচলন রাজার মতো। তাই তো সে আমাদের জাতীয় পশু। সুন্দরবনই হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বৃহত্তম আবাসভূমি।

রয়েল বেঙ্গলসহ বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর; ঠিক তেমনই ভয়ংকর। বাঘ আসলে বড়ো বিড়াল জাতের অন্তর্ভুক্ত একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। সিংহ, চিতাবাঘ ও জাগুয়ারের সঙ্গে প্যানথার গণের চারটি বিশালাকার সদস্যের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়ো ও শক্তিশালী প্রাণী। বাঘ ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় পশু। অতীতের তুলনায় বিশ্বে বাঘের সংখ্যা অনেক কমেছে। ইতিহাসের তথ্যমতে, ১০০ বছর আগেও পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা ছিল এক লাখেরও বেশি। বর্তমানে সে সংখ্যা ৯৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৯০০টিতে। তবে বিশ্বব্যাপী সচেতনতায় এখন আবার বাড়ছে বাঘের সংখ্যা।

২৯শে জুলাই বিশ্ব বাঘ দিবস। বাঘের প্রাকৃতিক

আবাস রক্ষা করা এবং বাঘের সংরক্ষণের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এর সম্পর্কে থাকা ভুল ধারণা ও ভয় দূর করে টিকিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি নিয়েই পালিত হয় আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস। ২০২২ সালের বাঘ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'বাঘ আমার অহংকার, রক্ষার দায়িত্ব সবার।'

বিশ্বজুড়ে বাঘ বিপন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালে রাশিয়ায় প্রথমবারের মতো বাঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা বিশ্বে দিবসটি পালন করা হলেও বাঘ টিকে আছে মাত্র ১৩টি দেশে। বিশ্বে ভয়াবহভাবে বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সম্মেলন

বাঘ শুমারির সাল	বাঘের সংখ্যা
১৯৭৫	৩৫০টি
১৯৮২	৪২৫ টি
১৯৮৪	৪৩০-৪৫০টি
১৯৯২	৩৫৯টি
১৯৯৩	৩৬২ টি
১৯৯৪	৩৬৯ টি
১৯৯৬-৯৭	৩৫০-৪০০ টি
২০০৪	৪৪০ টি
২০১৫	১০৬টি
২০১৮	১১৪টি

থেকে প্রতি বছর এই দিনে আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বন বিভাগের দেওয়া তথ্য মতে, আসন্ন অক্টোবর ২০২২ থেকে আবারও শুরু হতে যাচ্ছে বাঘ শুমারি। বন বিভাগ ও বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যামেরা ফাঁদই সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। চাঁদপাই, শরণখোলাসহ মোট চারটি রেঞ্জের ৪০ ভাগ জরিপের আওতায় আনা হবে। বসানো হবে ৩৫০টি ক্যামেরা। বাঘ বিশেষজ্ঞসহ জরিপ দলে থাকবেন ৪০ থেকে ৪৫ জন। বর্তমানে সুন্দরবনের বাঘের আনাগোনা যেভাবে দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুন্দরবন পশ্চিম বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তারা জানান, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন ৬ হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার। এ অংশের প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা ২৩ শতাংশ বাঘেদের জন্য আগে সংরক্ষিত ছিল। বাকি অংশে পর্যটক ও স্থানীয় অধিবাসীরা অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারতেন। সম্প্রতি এই অভয়ারণ্য দ্বিগুণের কিছু বেশি অর্থাৎ ২৩ থেকে বাড়িয়ে ৫২ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই সিদ্ধান্তের ফলে সারা দুনিয়ায় বাঘের অন্যতম বড়ো আবাসভূমি হিসেবে পরিসর বাড়ল সংরক্ষিত এলাকার। এর আগে, ১৯৯৬ সালের ৬ই এপ্রিল পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে সুন্দরবনের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের ১ লাখ ৩৯ হাজার ৬৯৯ দশমিক ৪৯৬ হেক্টর এলাকাকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়।

এবার সেই প্রজ্ঞাপন বাতিল করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বন শাখা-২) থেকে গত ২৯শে জুন নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়, বর্তমানে উক্ত অভয়ারণ্য এলাকা সম্প্রসারণের প্রয়োজন হওয়ায় বন অধিদপ্তরের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২-র ধারা ১৩-র ক্ষমতাবলে আগের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অধিকতর সংশোধনক্রমে সরকার সংরক্ষিত এলাকাকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর সাথে সুন্দরবনে বনদস্যুদের আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা ও চোরাশিকারিদের দৌরাত্ম্য কম হওয়ায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা বাঘের সংখ্যা সর্বশেষ জরিপে বেড়েছে। বাড়ানো হয়েছে টহল ফাঁড়ি। পাশাপাশি চোরা শিকারিদের তৎপরতা বন্ধে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট পেট্রোলিং চালু করা হয়েছে। বাঘের প্রজনন মৌসুম জুন থেকে আগস্ট । সুন্দরবনের সব পাস পারমিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে করে প্রজনন, বংশ বৃদ্ধিসহ বাঘ অবাধ চলাচল করতে পারবে। ■

নতুন এক ফুলের কথা

মো. ইকবাল হোসেন

ফুল দারুণ এক অনুভূতির নাম। ফুল দেখলেই ছুঁতে ইচ্ছা করে, সুভাস নিতে আগ্রহ জাগে। কিছু ফুলের গন্ধে সুবাসিত হয় চারিপাশ। ফুল ভালোবাসে না এমন কেউ নেই। ফুল নিয়ে আছে শত শত গল্প, কবিতা, ছড়া আরো কত কি! কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীতে উঠে আসে নানা ফুলের কথা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকরের লেখায়ও ফুলের কথা উঠে এসেছে এভাবে–

ফাল্গুনে বিকশিত
কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত
আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি
গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে
দক্ষিণবায়

বন্ধুরা, বাংলাদেশ সবুজ শ্যামলে ভরা দেশ, যে দিকে চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। আর এ সবুজে মিশে আছে হাজারো ফুলের গাছ। কিছু ফুলের উৎস আমাদের দেশ, আবার অনেক ফুলের উৎসই বিদেশ। অদিকাল

থেকেই নানা উপায়ে এই ভিনদেশি ফুল স্থান করে নিয়েছে আমাদের মাতৃভূমিতে। সম্প্রতি আমাদের দেশে দেখা মিলেছে এক নতুন ফুলের। নাম তার বুনো চিনাবাদাম ফুল। ফুল হলুদ রঙের। এটি ব্রাজিলের গুল্ম। বিশ্বে যার পরিচিতি 'পিন্টো পিনাট' নামে। আমাদের চিরচেনা চিনাবাদামের ইংরেজি নাম পিনাট। ১৯৫৪ সালে ব্রাজিলের উদ্ভিদবিদ জেরাল্ডো পিন্টো বুনো জাতের চিনাবাদামের লতা আবিষ্কার করেন। তাই তার নামের সাথে মিলে এর নামকরণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম Arachis pintoi. এটি আমাদের সুপরিচিত চিনাবাদামের সঙ্গে জড়িতে। বহুবর্ষজীবী লতানো গুল্ম। মাঠে-প্রান্তরে দেখা মেলে বেশি। দেখতে চিনাবাদাম গাছের মতো হলেও বাদাম গাছের মতো লম্বা হয় না।

এ ফুল গাছের লতা কখনোই মরে না। খোলা স্থানে একবার লতা লাগালে ছড়িয় যায় পুরো জায়গায়। শক্ত চিকন লতার ডাঁটিতে পাতা থাকে দুই জোড়া করে। পাতা লম্বায় তিন সেন্টিমিটার। ডিম্বাকার পাতা সামনে মোটা এবং বোঁটার দিকে চিকন। লতা মাটিতে বিছিয়ে থাকলেও ফুল থাকে আকাশমুখী। ফুলের আকার দুই সেন্টিমিটার। দেখতে অনেকটা শিমফুলের মতো। মাঠে গালিচার মতো সকালের ফোটা ফুলগুলো দেখতে ভারি চমৎকার। রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়ে। বছর জুড়ে কমবেশি ফুটলেও গ্রীষ্ম-বর্ষায় ফোটে অনেক বেশি।

বাংলাদেশে প্রথম এই বুনো চিনাবাদাম ফুল দেখা যায় ঢাকায় অবস্থিত খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের সামনে। সকাল হলেই চোখে পড়ে নরম হলুদ ফুলে সেজে উঠেছে। তবে এ বছর এখানে এই ফুল ফুটতে দেখা যায়নি। এবার এটি দেখা মিলেছে আর্মি স্টেডিয়ামের সামনে এবং ধানমণ্ডি শিল্পগুরু শফিউদ্দিন আহমেদ চত্বরের সামনে। বন্ধুরা, এভাবেই একটি স্থান থেকে আরেকটি স্থানে ছড়িয়ে যাবে এই নতুন ফুল। বাড়ির আঙিনায় কিংবা ছাদে দেখা যাবে বাতাসে দোল খাচ্ছে চিনাবাদাম ফুল। অন্যান্য গাছের সাথে লাগাবো দারুণ দেখতে এই ফুল গাছটিও। ■

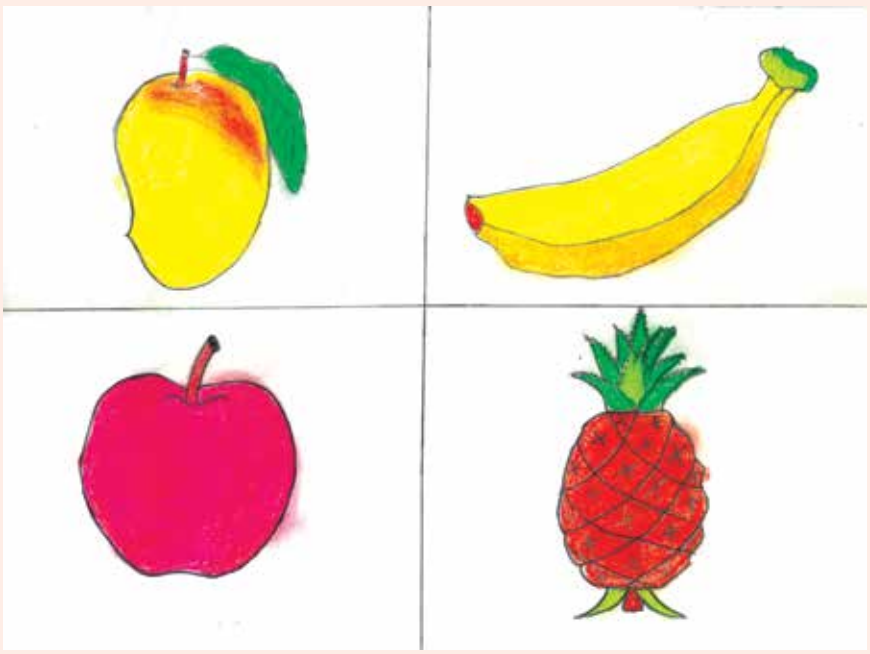

মো. আব্দুল্লাহ, ১ম শ্রেণি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঘার পাড়া, যশোর

তারার বৃষ্টি

মুহসীন মোসাদ্দেক

আকাশ দেখছে ভাইবোন ছাদের রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে।

'আকাশটা তো পুরাই ফাঁকা। এমন আকাশ মানায় নাকি!' ঠোঁট উলটিয়ে বলল বোন।

ভাই আশ্বস্ত করল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এখনই আকাশজুড়ে ফুটে উঠবে একের পর এক তারা।'

সত্যি সত্যি আকাশে ফুটে উঠতে লাগল নানা রঙের

তারা।

'এই যে, এখানে একটা হলুদ তারা।' হাত উঁচিয়ে দেখাল ভাই।

বোন দেখাল, 'ওই তো, ওইখানে নীল তারা।'

'তারা কি নীল হয় নাকি!'

'হবে না কেন! দেখ লাল তারাও আছে!'

'আহা! তারা লাল-নীল হলে কেমন যেন হয়!'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ভাইবোন। রংতুলি হাতে। ক্যানভাসের সামনে। কিছুক্ষণ আগে তা সাদা কাগজ ছিল। এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে, ছাদের রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরই মতো ভাইবোন তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তারা আকাশ দেখছে, তারাভরা রঙিন আকাশ

'কেন! কেমন হয়!'

'কেমন যেন বেমানান! তারা হবে সোনালি, না হলে রূপালি, আর না হলে সজিনা ফুলের মতো ফকফকা সাদা।'

'তাহলে প্রথমটা হলুদ হলো কীভাবে?'

'উ-ম-ম! হলুদ তো সোনালির কাছাকাছি, এই জন্য।'

'না, তোমার হলুদ রং পছন্দ। আমি জানি। এজন্য তুমি হলুদ রঙের তারা দেখাচ্ছ।'

'হুম, তা ঠিক।'

'আমারও লাল-নীল রং পছন্দ। আমি লাল-নীল তারা দেখাব।'

'আমার বেগুনি রংও পছন্দ, তাহলে একটা বেগুনি তারা দেখাই এই যে।'

'আমার গোলাপি ভালো লাগে। আমি তাহলে একটা গোলাপি তারা দেখাই ওই যে।'

'টিয়ে রংটা দেখতে খুব সুন্দর। টিয়ে রঙের কয়েকটা তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলে বেশ সুন্দর লাগে, তাই না?'

'হ্যাঁ, এই যে এখানে ওখানে আর সেখানে টিয়ে রঙের তারা।'

'আচ্ছা, তারা শুধু একরঙা কেন হবে? দোরঙা কিংবা তেরঙা তারা হলে কেমন হয়?'

'একদম ইয়াম্মি হয়!'

'ধুর বোকা! তারা খাওয়ার জিনিস নাকি!'

'কেন! দেখার জিনিস ইয়াম্মি হতে পারে না!'

'না, দেখার জিনিস হবে দৃষ্টিনন্দন বা নজরকাড়া!'

'ওই হলো, আমার কাছে ওটাই ইয়াম্মি!'

'আচ্ছা, বাদ দাও। এসো দোরঙা তারা দেখি।'

'চলো। তেরঙা তারাও দেখে ফেলি।'

আকাশটা এভাবে নানা রঙের তারায় ভরে উঠল। আকাশটা এভাবে রঙিন হয়ে উঠল।

'শুনেছি, কিছু কিছু তারা নাকি মাঝে মাঝে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে! ওদের বলে ফলিং স্টার!'

'তাই নাকি! আমি ফলিং স্টার দেখব!'

বোনের আবদারের পর ভাই আকাশজুড়ে চোখ বোলাতে থাকে।

'এই যে একটা ফলিং স্টার।'

'আরে! ওই যে আরেকটা ফলিং স্টার।'

'দেখ, দেখ, আরো আরো ফলিং স্টার।'

'ইস! তারাগুলো সব টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে! বৃষ্টি হচ্ছে যেন! তারার বৃষ্টি!'

'বাহ! ভালো বলেছ তো! তারার বৃষ্টি!'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ভাইবোন। রংতুলি হাতে। ক্যানভাসের সামনে। কিছুক্ষণ আগে তা সাদা কাগজ ছিল। এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে, ছাদের রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরই মতো ভাইবোন তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তারা আকাশ দেখছে, তারা ভরা রঙিন আকাশ। আর সেই আকাশ থেকে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে নানা রঙের তারা!

বৃষ্টি হচ্ছে যেন! তারার বৃষ্টি!

গল্পকার

পানিতে ডুবা প্রতিরোধে করণীয়

আবদুল খালেক খান

বাংলাদেশে প্রতিবছর পানিতে ডুবে অনেকের মৃত্যু ঘটে। তারমধ্যে শিশুমৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ পানিতে ডুবে মৃত্যু। গ্রামের শিশুরাই নয়, শহরের শিশুরাও বেড়াতে গিয়ে এমন করুণ মৃত্যুর শিকার হয়। এমনকি খুব অল্প পানিতেও শিশু মারা যেতে পারে। পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা বেশির ভাগই ঘটে পুকুর ও খালে পড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়ে বেশি ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। পানিতে ডুবে মৃত্যুর প্রধান কারণ হলো ডুবন্ত ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। পানি শ্বাসনালি ও ফুসফুসে ঢুকে যাওয়ার কারণেই মূলত এমনটি হয়ে থাকে। এভাবে দুই থেকে তিন মিনিট শ্বাস বন্ধ থাকলে মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। আর চার থেকে ছয় মিনিট যদি শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে, তাহলে মৃত্যু ঘটে। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হওয়া ছাড়াও প্রচুর পানি পান করার কারণে রোগীর পাকস্থলি ফুলে যায়। পানিতে ডুবে এই মৃত্যু কিছুটা হলেও ঠেকানো সম্ভব যদি কিছু বিষয় মেনে চলা যায়। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও ইনজুরি সার্ভে অনুযায়ী এদেশে প্রতিবছর প্রায় ১৭ হাজার শিশু মারা যায় পানিতে ডুবে। যাদের বয়স ১ থেকে ৪ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪৬ জন শিশু মারা যায়। এমন পরিস্থিতির মধ্যে ২৫শে জুলাই দ্বিতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হয় 'বিশ্ব পানিতে ডুবা প্রতিরোধ দিবস'

বিভিন্ন কারণে মানুষ পানিতে ডুবে যেতে পারে। পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণ জানা থাকলে সতর্ক থাকার পাশাপাশি চিকিৎসায়ও অনেক সময় সুবিধা হয়। সাঁতার না জানা কোনো ব্যক্তি পুকুর, নদীতে কিংবা গভীর কোনো জলাশয়ে পড়ে গেলে, নৌ দুর্ঘটনার কবলে পড়লে, সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে যানবাহন পানিতে পড়ে গেলে, বন্যা কিংবা নদী ভাঙন বা জলোচ্ছ্বাসের সময় পানিতে পড়ে গেলে, অসাবধানতাবশত শিশু পানিতে পড়ে গেলে বা বহুবিধ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পানিতে ডুবে মারা যেতে পারেন।

কেউ পানিতে ডুবে যাচ্ছ বা এইমাত্র ডুবে গেলো দেখে আতঙ্কিত না হয়ে মাথা ঠান্ডা রাখুন। আশপাশের মানুষের সাহায্য চান এবং ডুবন্ত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব পানি থেকে তুলে আনুন। পানি থেকে ডুবন্ত ব্যক্তিকে তোলার পরই তাকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে খেয়াল করতে হবে যে তিনি শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছেন কি না। তার নাম ধরে ডাকুন দেখুন সাড়া দেয় কি না, যদি শ্বাসপ্রশ্বাস না থাকে বা শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়, তাহলে দেখতে হবে শ্বাসনালির কোথাও কিছু আটকে আছে কি না। যদি থাকে তবে আঙুল দিয়ে মুখের মধ্যে কাদামাটি বা কোনো দ্রব্য থাকলে তা বের করে দিতে হবে। এরপরও শ্বাস না নিলে

মাথা টানটান করে ধরে মুখ হা করাতে হবে। এবার উদ্ধারকারী ব্যক্তিকে বুক ভরে শ্বাস নিতে হবে এবং ডুবন্ত ব্যক্তির নাক হাত দিয়ে চেপে মুখের সঙ্গে এমনভাবে মুখ লাগাতে হবে যেন কোনো ফাঁকা না থাকে। শিশু বা কম বয়সী কেউ ডুবে গেলে নাক-মুখ সম্পূর্ণ একসঙ্গে মুখের মধ্যে পুরতে হবে। এ অবস্থায় উদ্ধারকারী জোরে শ্বাস নিয়ে ডুবন্ত ব্যক্তির মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দিতে হবে। দেখতে হবে যে শ্বাস দেওয়ার ফলে ডুবন্ত ব্যক্তির পেট ফুলে যায় কি না। যদি পেট ফুলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে কৃত্রিম উপায়ে এভাবে শ্বাস দেওয়া ঠিকমতোই হচ্ছে। ডুবন্ত ব্যক্তি নিজে থেকে শ্বাস না নেওয়া পর্যন্ত এভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

কৃত্রিমভাবে এভাবে শ্বাস প্রদানের পাশাপাশি হাত ধরে কিংবা গলার অ্যাডামস অ্যাপেলের এক পাশে হাত দিয়ে দেখতে হবে যে নাড়ির স্পন্দন আছে কি না। যদি না থাকে, তাহলে দ্রুত বুকের মধ্যভাগ থেকে সামান্য বাঁ পাশে হাত রেখে জোরে জোরে চাপ দিতে হবে যেন বুক বেশ খানিকটা দেবে যায়। এক থেকে দুই বছরের শিশু হলে তার বুক দুই হাত দিয়ে ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিতে হবে। এভাবে প্রতি ৩০ বার চাপ দেওয়ার পর আগের মতো দুইবার করে শ্বাস দিতে হবে। নাড়ির গতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ রকম চক্রাকারে চালাতে হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা কমে গেলে পানি থেকে তুলে তাকে কাপড়চোপড় দিয়ে ভালো করে ঢেকে রাখা উচিত। রোগীর অবস্থা ভালো থাকলে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নিলে ও হৃৎস্পন্দন চালু থাকলে তাকে কুসুম গরম দুধ, চা ইত্যাদি খেতে দেওয়া যেতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে পানি থেকে তুলে উলটো করে শুইয়ে পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করার চেষ্টা করা মোটেও ঠিক নয়। এতে ওই ব্যক্তি বমি করে ফেলতে পারে, যা আবার ফুসফুসে প্রবেশ করে পরবর্তী সময়ে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আবার সাঁতারে পারদর্শী নয়, এমন কোনো ব্যক্তির ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করতে যাওয়া উচিত নয়, কারণ এতে দুজনের জীবনই বিপন্ন হতে পারে। রোগীর ফুসফুস ও শ্বাসনালি থেকে পানি বের করার জন্য খুব বেশি সময় না নেওয়াই শ্রেয়। প্রাথমিক চিকিৎসা চলার পাশাপাশি রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে।

বাংলাদেশে স্থানভেদে দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজ, নদীপথে যাতায়াত, পেশা হিসেবে জেলেদের পানির সঙ্গে সখ্য অনিবার্য। স্বভাবতই শিশুরা তাদের বাবা-মাকে অনুসরণ করে। এভাবেই কর্মব্যস্ত বাবা-মায়ের দৃষ্টির আড়ালে পানিতে ডুবে অকালে প্রাণ হারায় কোমলমতি শিশুরা। শিক্ষার সঙ্গে সচেতনতার বিষয়টি অনস্বীকার্য। কোনো শিশুকে পানি থেকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাসপাতাল পর্যন্ত নেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শুরু হয় কুসংস্কারের অনুশীলন। শিশুকে

মাথায় নিয়ে নাচা, দৌড়ানো, গায়ে ছাই মেখে ঢেকে রাখা, আরো কত কী কর্মকাণ্ড চলে! এভাবে শিশুর মৃত্যুকে করুণভাবে নিশ্চিত করা হয় কেবল অজ্ঞতার কারণে। অথচ সামান্য তথ্য জ্ঞাপন ও প্রশিক্ষণ মানুষকে সচেতন করতে পারে। এতে বেঁচে যেতে পারে সম্ভাবনাময় অনেক শিশুর প্রাণ। শুধু জানা দরকার পানি থেকে উদ্ধার করা জীবিত শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা কী? এটি কোনো জটিল বিষয় নয়। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে একাডেমিক শিক্ষারও তেমন প্রয়োজন নেই। কেউ পানিতে ডুবে যেতে থাকলে তাকে উদ্ধার করতে হবে পেছন দিক থেকে। নয়তো ডুবন্ত ব্যক্তি তাকে জাপটে ধরে ফেলতে পারে, যাতে উভয়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা সর্বাধিক। যদি উদ্ধারকারী ব্যক্তি সাঁতার না জানেন, তাহলে একটি লাঠি বা রশি হয়ত দুজনকেই বাঁচাতে পারে। দরকার শুধু সামান্য প্রশিক্ষণের। দরকার উদ্ধার কৌশল জানার।

করণীয়: পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য। এজন্য এ ধরনের মৃত্যু ঠেকাতে কিছু বিষয় অনুসরণ করতে হবে, যেমন-

প্রতিরোধের উপায়

পানিতে ডোবা থেকে দূরে থাকতে কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনুসরণ করা যেতে পারে। পানিতে ডোবা প্রতিরোধে সাঁতার শিখুন। শিশুরা বাথটাবে কিংবা পানিভর্তি বালতিতেও ডুবে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সাবধানতার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য শিশুর নিরাপত্তায় পানি ধরে রাখার পাত্রগুলোয় ঢাকনার ব্যবস্থা করতে হবে। বেড়াতে গিয়ে শিশু পুকুর-নদীতে গোসল করার সময় জলাশয়ের কাছে বয়স্ক মানুষের তত্ত্বাবধান ছাড়া একা কিংবা দলবেঁধেও ঘুরতে যেতে দেওয়া ঠিক নয়। শিশুর মা কাজে ব্যস্ত থাকার সময় পরিবারের অন্য সদস্যের শিশুর দেখভালের দায়িত্ব নিতে হবে। গ্রামে পুকুর-খালের চারপাশে বেড়া দিয়ে দিন, যেন শিশু অসাবধানতাবশত পুকুরে যেতে না পারে। নদীপথে যাত্রার সময় লাইফ জ্যাকেট পরিধান করুন। যাদের খিঁচুনি আছে, তারা পুকুরে বা সুইমিংপুলে সাঁতার কাটা থেকে বিরত থাকবেন। ■

প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

সুস্মিতা শীল, ১ম শ্রেণি, সেন্ট মে রিস স্কুল, চট্টগ্রাম

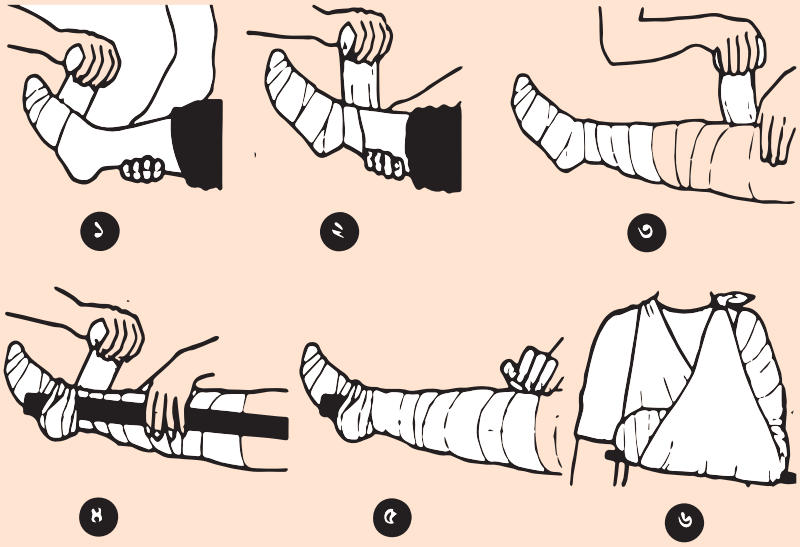

সাপে কাটায় দ্রুত কিছু পদক্ষেপ

ছোট্ট বন্ধুরা, মে থেকে অক্টোবর মাসে অর্থাৎ বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বাড়ে। এ সময় স্থলভাগ ডুবে যাওয়ায় সাপ নতুন বাসস্থানের সন্ধানে বাসাবাড়ির উঁচু স্থানে আশ্রয় খোঁজে। এবার বাংলাদেশে আগাম বন্যায় সাপে কাটা মানুষের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

সাপকে ভয় পায় না এমন মানুষ বিরল। সাপে কামড়ালে ভয়েই রোগী অর্ধমৃত হয়ে যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি বিপদের আশঙ্কা আছে? আমাদের দেশে প্রায় ১০০ প্রজাতির সাপ আছে, যার মধ্যে কেবল ছয় প্রজাতির সাপ বিষধর , বাকি ৯৪ প্রজাতির সাপের কোনো বিষ নেই। অর্থাৎ এই ৯৪ প্রজাতির সাপ কামড়ালে কোনো সমস্যা নেই, চিকিৎসা ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। এই সুযোগটাই নিয়ে থাকেন ওঝারা।

বিষধর সাপের দংশন আর চিকিৎসা শুরুর সময়ের পার্থক্য যত কম হবে, চিকিৎসার সফলতার সম্ভাবনা তত বেশি। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় রোগী ওঝার পর্ব শেষ করে তারপর হাসপাতালে যখন আসে, ততক্ষণে অনেক মূল্যবান সময় অপচয় হয়ে গেছে, রোগীর প্রাণ যায় যায়। বিষধর সাপের দংশনে প্রতিবছর স্বয়ং অনেক ওঝা হাসপাতালে ভর্তি হন এবং মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বেশি। সাপে কামড়ালে করণীয় কী, এ বিষয়ে তোমাদেরকে আজ জানাব।

সাপ হাতে বা পায়ে কামড়ালে আমরা সাধারণত আক্রান্ত অংশের ওপর রশি বা গামছা দিয়ে টাইট করে বেঁধে রাখি। এটা একেবারেই ভুল প্রাথমিক চিকিৎসা । আলতোভাবে বাঁধা যেতে পারে বা ১০মিনিট পরপর কয়েক মিনিটের জন্য বাঁধন খুলে দেওয়া যেতে পারে (চিত্র ১,২ও ৩ এর মতো করে)। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো আক্রান্ত হাতের বা পায়ের দুই পাশে বাঁশের বা কাঠের ফালি দিয়ে তার ওপর আলতো করে বাঁধা, যেন নড়াচড়া কম হয় (চিত্র ৪,৫ ও ৬ এর মতো করে)। একটানা শক্ত করে বেঁধে রাখলে দীর্ঘক্ষণ রক্ত চলাচল বন্ধ থাকায় পচন ধরতে পারে। চিরতরে হারাতে হতে পারে হাত-পা। যে-কোনো সাপে কাটা রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে। কারণ সাপটি বিষধর ছিল কিনা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না, এ জন্যে রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। ডাক্তার যদি বিষক্রিয়ার কোনো লক্ষণ রোগীর মধ্যে দেখেন তাহলে অ্যান্টিভেনাম ইনজেকশন প্রয়োগ করে থাকেন। তাই এখন সাপে কামড়ালে আর ওঝা নয়, সরাসরি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। ■

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশ করল বাংলাদেশ

প্রথম দুই ম্যাচে সহজেই জয়। তৃতীয় ম্যাচে এসে হলো একটু লড়াই এবং শেষ পর্যন্ত সে লড়াইয়েও জিতে যায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে ৪ উইকেটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ৬ ও দ্বিতীয় ম্যচে জয় পেয়েছে ৯ উইকেটে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ওয়ানডেতে হোয়াইট ওয়াশ করল বাংলাদেশ।

তৃতীয় ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নেওয়া বাংলাদেশের প্রথম সাফল্য আসে স্পিনার তাইজুল ইসলামের হাত ধরে। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে ৯ বল খেলে ৮ রান করা ব্রেন্ডন কিংকে বোল্ড করেন তিনি। দ্বিতীয় সাফল্যটাও আসে তার থেকে। এবার ১৫ বলে ২ রান করা শাই হোপকে স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলেন তিনি। ১৫ রানে ২ ওপেনারকে হারিয়ে বিপদে পড়ে ক্যারিবীয় দল। তাদের এই বিপদ আরো বাড়িয়ে দেন পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি ফেরান ৮ বলে ৪ রান করা শামারাহ ব্রুকসকে এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলে। ক্যারিবীয় ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক নিকোলাস পুরান ও কেসি কার্টি। স্বাচ্ছন্দ্যে খেলে দুজন গড়েন ৬৭ রান। কিন্তু ২৭তম ওভারে এসে তাদের জুটিও থেমে যায়। নাসুম আহমেদের বলে তামিম ইকবালের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফিরেন কেসি কার্টি। এর আগে কার্টি করেন ৬৬ বলে ৩৩ রানের সম্ভাবনাময়ী ইনিংস।

এরপরও কিছুটা আশার আলো হয়ে দাঁড়ান পুরান। তার হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলার পর হাত খুলেছিল ক্যারিবীয় অধিনায়করেও। তবে তাকে বোল্ড আউট করে নিজের ফাইফার পূরণ করেন তাইজুল ইসলাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলআউটের পথে বাধা ছিলেন পুরান। কিন্তু তিনিও ৪টি চার ও ২টি ছক্কায় ১০৯ বলে ৭৩ রান করে সাজঘরে ফেরত যান। ৪৮ ওভার ৪ বলে ১৭৮ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশের তাইজুল ইসলাম ১০ ওভারে ২ মেডেনসহ ২৮ রানে নেন ৫ উইকেট। ১৭৯ রানের লক্ষ্যে খেলতে নামা বাংলাদেশ দল প্রথম দিকে নাজমুল হোসেন শান্তকে হারালেও দলকে এগিয়ে নেন তামিম ইকবাল ও লিটন দাস। কিন্তু তামিম ইকবাল গুদাকেশ মোতির বলে সুইপ খেলতে গিয়ে বল আকাশে তুলে মেরে আকিল হোসেন হাতে ক্যাচ হন। এ আগে তিনি ৫২ বলে ৩৪ রান করেন। ভেঙে যায় লিটনের সঙ্গে তার ৫০ রানের জুটি। এরপরও লিটন খেলে যাচ্ছিলেন স্বাচ্ছন্দ্যে। তুলে নিয়েছিলেন হাফ সেঞ্চুরিও। কিন্তু তিনিও গুদাকেশ মোতির বলে আউট হয়ে যান। করেন ৫টি চার ও ১টি ছক্কায় ৬৫ বলে ৫০ রান। এরপর মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ব্যাট থেকে আসে ৬৫ বলে ৫০ রান । তিনি স্ট্যাম্পিং হয়ে সাজঘরে ফিরলে বাকি পথটা পাড় করেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও নুরুল হাসান সোহান। ৩৮ বলে ৩২ রানে সোহান ও ৩৫ বলে ১৬ রান করে অপরাজিত থাকেন মিরাজ। দারুণ এক জয় নিয়ে সিরিজের সমাপ্তি টানে বাংলাদেশ। ■

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

বিতর্কের বিশ্বকাপ জিতল বাংলাদেশ

‘বিতর্কের বিশ্বকাপ’ খ্যাত বেলগ্রেড ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিজ ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউইউডিসি) ২০২২-এর ওপেন ফাইনাল জিতলে বাংলাদেশের দুই শিক্ষার্থী। বিজয়ী দলের দুই গর্বিত সদস্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবের শিক্ষার্থী সৌরদীপ পাল ও সাজিদ আসবাত খন্দকার। প্রতিযোগিতায় ‘ব্র্যাক এ’ নামের দলটির প্রতিনিধিত্ব করেন তারা। দুই জনই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ছেন।

‘বিতর্ক বিশ্বকাপ’ খ্যাত ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের আসর বসেছিল সার্বিয়ার বেলগ্রেডে। ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় প্রতিযোগিতার

ফাইনাল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। করোনা মহামারির কারণে গত বছরের মতো এবারও পুরো প্রতিযোগিতা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিতর্কের এবারের বিষয় ছিল ‘This House Supports a decline in global reliance on the dollar’ আর এবারের বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল বেলগ্রেড। ‘ব্র্যাক এ’ নামের দলটিই বাংলাদেশের প্রথম দল, যারা এই বর্ণাঢ্য প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠে। এ প্রতিযোগিতায় ফাইনালে ওঠার আগে বাংলাদেশ হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, শিকাগো ও স্ট্যানফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের টিমগুলোকে পরাজিত করেছে। ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর এবং তাদের অ্যাতেনিও ডি ম্যানিলা ইউনিভার্সিটি।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির মতো বিশ্ব সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল অংশ নেয়। তবে ব্র্যাক ছাড়া বাংলাদেশের কোনো দল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব পেরোতে পারেনি।

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিজ ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। একেক বছর একেক দেশ আয়োজন করে। প্রতিবারই বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে শুরু করে ছোটো-বড়ো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৪০০টি দল অংশ নেয়। প্রতিটি দলে ২ জন করে বিতার্কিক থাকেন। বিতর্কের প্রতিটি পর্বে ৪টি দল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে এই বিশ্বকাপে বিতর্কের আসর বসবে স্পেনে, চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। ■

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

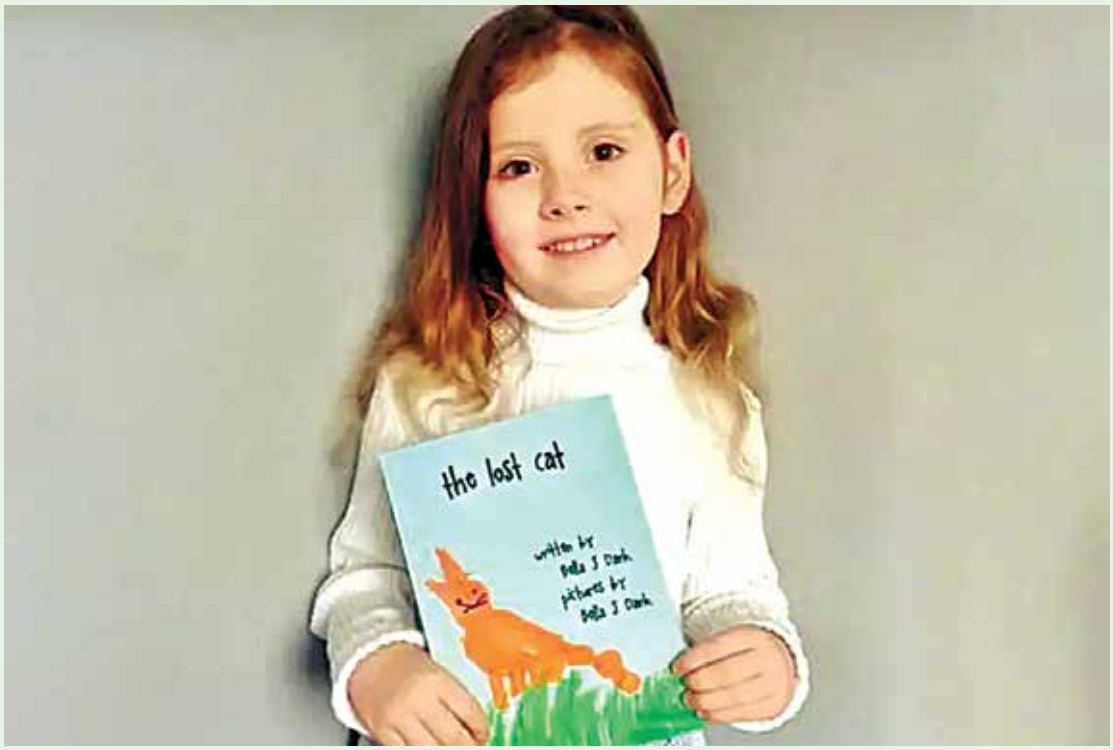

পাঁচ বছর বয়সে বিশ্ব রেকর্ড

যে বয়সে ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলা নিয়েই ব্যস্ত থাকে বেশি, পড়ালেখার হাতেখড়ি হয় মাত্র, সেই বয়সে সবাইকে চমকে দিয়ে বই লিখে বিশ্ব রেকর্ড গড়ল এক শিশু। নাম বেলা জে ডার্ক। এই অসাধ্য সাধন করা কন্যাশিশুটি ব্রিটেনের বাসিন্দা। তার লেখা বইটির নাম 'দ্য লস্ট ক্যাট'। প্রকাশিত হয়েছে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রকাশ করেছে জিনজার ফায়ার প্রেস প্রথম। মাসেই বিক্রি হয়েছে এক হাজার কপি।

সম্প্রতি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বেলা জে ডার্ককে দিয়েছে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ লেখকের (নারী) স্বীকৃতি। বেলার বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর ২১১ দিন। বেলার লেখা 'দ্য লস্ট ক্যাট' বইটি একটি বিড়ালকে নিয়ে লেখা। যে রাতে একা বাইরে যাওয়ার পর হারিয়ে যায়। বড়ো বোন ল্যাসি মে-এর আঁকা একটি বিড়ালের ছবি থেকে গল্পের ধারণা পায় বেলা। তাঁর মা চেলসি সাইমের সাহায্য নিয়ে মাত্র পাঁচ দিনে গল্পটি লিখে ফেলে বেলা। বেলা বরাবরই খুব কল্পনাপ্রবণ। তিন বছর বয়স থেকেই সে নানান গল্প বানাতে পারত। বেলার আগে এই রেকর্ডটি ছিল ডরোথি স্ট্রেইট নামের এক শিশুর। তার লেখা বই 'হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড বিগান' যখন প্রকাশিত হয় তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালের আগস্টে। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

যে গাছ হেঁটে বেড়ায়

আব্দুল্লাহ আল মামুন

গাছেরা যদি হাঁটতে জানত কেমন হতো ভাবো তো একবার বন্ধুরা। কিছু মানুষ কুড়াল-করাত নিয়ে আসছে গাছ কাটতে, আর সেটা দেখে দৌড়ে পালাচ্ছে গাছ! এমনটা হলে দেখতে অবশ্যই অনেক মজার হতো! তবে দৌড়ে পালানোর সামর্থ্য না থাকলেও, শিকড়ের সাহায্যে নিজে নিজে জায়গা বদল করতে পারে এমন গাছ কিন্তু পৃথিবীতে আছে। জঙ্গলের মধ্যে গাছ হাঁটাচলা করছে নিজের মতো করে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের গহিন বনে এমন এক ধরনের গাছ রয়েছে, সেগুলো পা ফেলে দাপিয়ে না বেড়ালেও কয়েক মাস বা বছরের ব্যবধানে জায়গা পরিবর্তন করে। রাজধানী কুইটো থেকে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় বনভূমিতে দেখা মিলবে হেঁটে বেড়ানো দুর্লভ এই পামগাছের। এ গাছের স্থানীয় নাম 'ক্যাশাপোনা'। সেখানে বনাঞ্চলে ভূমিক্ষয় বেশি। তাই টিকে থাকার প্রয়োজনে শিকড়ের সাহায্যে জায়গা পরিবর্তন করে এসব গাছ। গাছটি কখনো কখনো দিনে দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার পর্যন্ত দূরে সরে যায়।

স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্লোভাক একাডেমি অব সায়েন্সেসের ভূবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের জীবাশ্মবিদ পিটার ভ্র্যানস্কি বনাঞ্চল ঘুরে এ গাছের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি জানান, বৃষ্টির কারণে অতিরিক্ত ভূমিক্ষয় হয় এবং জঙ্গল গভীর হওয়ায় সেখানে সর্বত্র সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে না। তাই গোড়ার মাটি যখন আলগা হয়ে আসে, তখন পাম গাছগুলো অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটি এবং বেশি আলোর খোঁজে উঁচু উঁচু শিকড় তৈরি করে থাকে। তখন একদিকে সেই নতুন শিকড় শক্ত মাটিতে ক্রমশ গেঁথে যেতে থাকে, অন্যদিকে পুরনো শিকড়গুলো মাটি থেকে তুলে নেয় ওরা। এভাবে গাছটি একটু খানি করে সরে যায়। গবেষক পিটার আরো জানান, এভাবে পুরোপুরি জায়গা বদল করতে একটি গাছের দুই বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। কখনো কখনো একটি গাছকে ২০ মিটার পর্যন্ত সরে যেতে দেখা যায়। এমনকি পার্শ্ববর্তী কোনো গাছে ঢলে পড়লেও জায়গা বদল করে ক্যাশাপোনা। ■

ছোটোদের আঁকা

সাথী নূর নাজিম , সপ্তম শ্রেণি, শেরে বাংলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মো. হিমেল, চতুর্থ শ্রেণি, নতুন কুঁড়ি কিন্ডার গার্টেন, শেরপুর

দুই বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দুই বছর মেয়াদি করার সিদ্ধান্ত অবশেষে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। বুধবার (২২শে জুন) শিক্ষাক্রমের রূপরেখায় বিষয়টি সংযোজন করে এই স্তরের নতুন শিক্ষাক্রমের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি)। আগামী বছর প্রাথমিক স্তরের ৩ হাজার ২১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে। এরপর ২০২৪ সালে তা সারা দেশের সব প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চালুর পরিকল্পনা আছে।

নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাক-প্রাথমিকে শিক্ষার মেয়াদ এক বছর থেকে দুই বছর করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমের আওতায় আগামী বছর থেকেই শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবেন। এ শ্রেণিতে দুই বছর অধ্যয়ন শেষে বয়স ছয় বছর পূর্ণ হলে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবে। এতদিন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এক বছরের ছিল। পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা এক বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শেষে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতো। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সময়সীমা এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর করা এবং এ স্তরে ভর্তির জন্য বসয়সীমা পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর করার বিষয়ে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে অনুমোদন দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিষয়টি অবশেষে এনসিসিসি অনুমোদন পেলো। আগামী বছর থেকেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ দুই বছর হচ্ছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত। তবে, প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরা লেসনবুকের চেয়ে টিচিং ম্যাটারিয়াল নিয়ে খেলাধুলা করে শিখবে। এক্ষেত্রে টিচিং লার্নিং মেথডটা ভিন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বই নেই। বাচ্চারা স্কুলে খেলনা নিয়ে খেলবে, রং নিয়ে আঁকিবুকি করবে। আগামী বছর থেকে চার বছর পূর্ণ হওয়া বাচ্চারা প্রাক-প্রাথমিক শুরু করবে। ■

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

শিক্ষকের তৈরি ব্রিজ

শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালোবাসার অনন্য এক নজির স্থাপন করেছেন এক শিক্ষক। নদী পাড়াপাড়ের জন্য নিজ খরচে তৈরি করেছেন ড্রাম ব্রিজ। এ ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করছে শিক্ষার্থী ও জনগণ। আর এ অসাধারণ কাজটি করেছেন শালমারা ঘোনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইব্রাহিম আলী। লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার সতী নদীর উপর ভাসমান এই ড্রাম ব্রিজ । এ ব্রিজ দিয়ে শুধু তার স্কুলের শিক্ষার্থী নয় আরও পাঁচ স্কুলের শিক্ষার্থীরাও যাতায়াত করছে। সতী নদীর ওপর পূর্বের ব্রিজটি বন্যায় ভেঙে যাওয়ায় শিক্ষার্থীরা চলাচলে দুর্ভোগে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন প্রধান শিক্ষক। ৮০ ফিট দীর্ঘ ব্রিজটি তৈরি হয়েছে ২০টি ড্রাম, বাঁশের চাটাই ও দড়ি দিয়ে। এখন আর পানিতে ভিজে স্কুলে যেতে হয় না তার প্রিয় শিক্ষার্থীদের। আবার দারুণ খুশি সকলে।

শিক্ষার্থীর নিজ হাতে লেখা কোরান

কলম থেকে যেন বের হচ্ছে মুক্তোর মতো ঝকঝকে ও তকতকে মহান আল্লাহর বাণী। কারোনাকালীন সময়ে একটি ব্যতিক্রমী কাজ করেছেন জারিন তাসনিম দিয়া। তার বাড়ি জামালপুর সদরে, সদ্য স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। করোনার দিনগুলোতে ঘরবন্দি জীবনে কিছু করতে সিদ্ধান্ত নেন পবিত্র কোরান শরীফ হাতে লেখার। এ কাজে সহায়তা করেছেন তার বাবা। নিজের হাতে পুরো ৩০ পারা কোরান শরীফ লিখেছেন। এত সুন্দর ঝকঝকে লেখাগুলো দেখলেই হৃদয় ছুঁয়ে যায়। জারিনের ইচ্ছা নিজের হাতে লেখা কোরান শরীফ মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিনামূল্যে বিতরণ করবেন। ২০২০ সালের মার্চে লেখা শুরু করে টানা ১৯ মাসে শেষ করেছেন। ৬৫০ পৃষ্ঠার বিশাল কাজ শেষ করার পর তাতে কোনো বানান বা ভুল হয়েছে কিনা তা যাচাই করিয়েছেন ৩০ জন হাফেজ দিয়ে। হাফেজদের কাছ থেকে অনাপত্তি পাওয়ার পর লেখা স্ক্যান করে তৈরি করেছেন এই কোরান।

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে কে-টু জয়

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বের ২য় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ পাকিস্তানের কে-টু চূড়া জয় করেছেন এভারেস্ট জয়ী পর্বতারহী ওয়াসফিয়া নাজরীন। ২২শে জুলাই তিনি কে-টু চূড়ায় পা রাখেন। বাংলাদেশের একমাত্র এবং প্রথম বাঙালি হিসেবে সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করার জন্য পরিচিত ওয়াসফিয়া। পর্বতারোহণ গাইড কোম্পানি এলিট এক্সপেডের তথ্য অনুযায়ী, ৩৯ বছর বয়সি ওয়াসফিয়া বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ১১ জন আরোহীর সঙ্গে এই মিশন সম্পন্ন করেছেন। এই চূড়ার উচ্চতা ২৮ হাজার ২৫১ ফুট। এরই মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১১ সালে শুরু হওয়া তার ৭ চূড়ায় উঠার অভিযান সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২ সালের ২৬শে মে তিনি বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী হিসেবে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছিলেন। এভারেস্টের চেয়ে কে-টু'র চূড়ায় আরোহণ শুধু যে কঠিন তা নয়, এখানে ওঠার জন্য কঠিন ও অস্থির আবহাওয়াও মোকাবিলা করতে হয়।

ঘড়ির কাঁটা উলটো ঘোরে

ঘড়ির কাঁটা যখন থাকবে এগারোটার ঘরে প্রচলিত নিয়মে এক ঘণ্টা পর বাজবে ১২টা। কিন্তু তুমি যদি হঠাৎ দেখো বারোটা না বেজে ঘড়িতে দশটা বাজে? নিশ্চয়ই অবাক হবে। ভারতের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ-অধ্যুষিত এলাকায় ঘড়ির কাঁটা প্রচলিত নিয়মে না ঘুরে কাঁটাটি ঘোরে উলটো। অর্থাৎ বা থেকে ডানে না গিয়ে ডান থেকে বামে ঘুরতে থাকে। ইন্ডিয়া টাইমস জানিয়েছে, ছত্তিশগড়ের উত্তরাঞ্চলীয় করিয়া জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী গণ্ড সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। গ্রামবাসীরা এভাবেই উলটো সময় দেখে নিজেদের জীবনযাপন ও কাজকর্ম সমন্বয় করে নিয়েছে। কিন্তু এই অদ্ভুত নিয়মটি কেন জানতে চাও? ওই সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বাস করেন, পৃথিবী ডান থেকে বামে ছোটে অবিরাম, তাই ঘড়ির কাঁটারও ডান থেকে বামে ছোটা উচিত। যদি ঘড়ির কাঁটা বা থেকে ডানে চলে তবে তা প্রকৃতির নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। এটা তাদের জন্য অশুভ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ। এতে তাদের ক্ষতি হতে পারে। ২০০৮ সাল থেকে তাই তারা এই ব্যতিক্রমী নিয়ম চালু করেছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ, ৩. পর্বতের গর্ত, ৫. ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক, ৭. কাক বা অন্যান্য পশু-পাখিকে ভয় দেখানোর জন্য জমিতে স্থাপিত মানুষের প্রতিকৃতি বিশেষ, ৯. অগ্রসর, ১০. মূল/ হেতু, ১১. এক ধরনের যুদ্ধাস্ত্র, ১২. সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত সমুদ্র সৈকত, ১৩. নতুন

উপর-নিচ: ১. মেঘনা নদীর সাথে একীভূত একটি নদী, ২. সারমর্ম, ৪. অস্ত্র, ৬. হিংসুক, ৮. রাজশাহী জেলার একটি উপজেলা, ১০. বাগান, ১১. বাবার ভাই

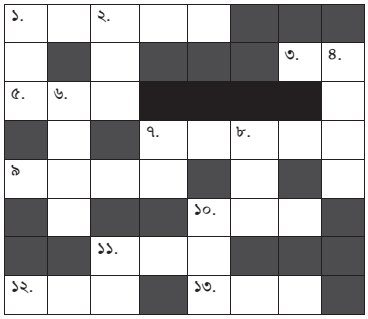

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: নিরাপদ সড়ক, পরশমণি, লব, কাবাডি পরোপকার, অবশ, সড়কবাতি, কলম

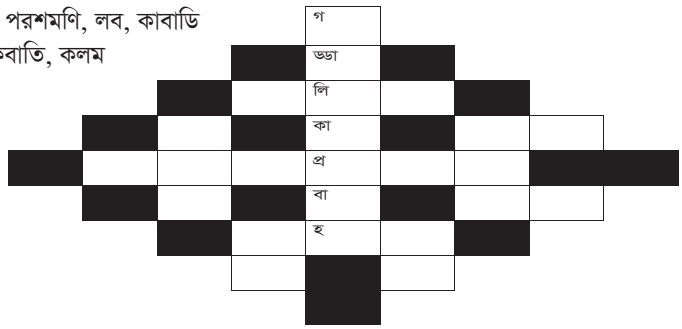

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫৫		৫৩	৪২					২৯
	৫৭			৪৪		৩৮		
৫৯			৫০		৩৬		৩২	
	৬১	৬২				৩৪		২৬
	৭৪			৪৭	১৮		২৪	
			৬৫	১৬		২০		২২
৭৭	৭২	৭১			১০			৭
	৭৯						৩	
৮১		৬৯	৬৮		১২	১		৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৯	/		-	২	=	
+		+		*		+
	+	২	-		=	৪
-		-		+		-
৮	/		-	৩	=	
=		=		=		=
	+	১	+		=	১০

জুন মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

তি	উ	নি	সি	য়া			
তা		র্যা				গু	হা
স	হি	স					তি
	ং		কা	ক	তা	ড়ু	য়া
আ	গু	য়া	ন		নো		র
	টে			কা	র	ণ	
		কা	মা	ন			
ক	ট	কা		ন	বী	ন	

ছক মিলাও

				নি				
				রা				
		প	রো	প	কা	র		
		র		দ			কা	
অ	ব	শ		স	ড়	ক	বা	তি
		ম		ড়			ডি	
		ণি		ক	ল	ম		
					ব			

নাম্ব্রিক্স

৫৫	৫৪	৫৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩০	২৯
৫৬	৫৭	৫২	৪৩	৪৪	৩৭	৩৮	৩১	২৮
৫৯	৫৮	৫১	৫০	৪৫	৩৬	৩৩	৩২	২৭
৬০	৬১	৬২	৪৯	৪৬	৩৫	৩৪	২৫	২৬
৭৫	৭৪	৬৩	৪৮	৪৭	১৮	১৯	২৪	২৩
৭৬	৭৩	৬৪	৬৫	১৬	১৭	২০	২১	২২
৭৭	৭২	৭১	৬৬	১৫	১০	৯	৮	৭
৭৮	৭৯	৭০	৬৭	১৪	১১	২	৩	৬
৮১	৮০	৬৯	৬৮	১৩	১২	১	৪	৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

৯	/	১	-	২	=	৭
+		+		*		+
৩	+	২	-	১	=	৪
-		-		+		-
৮	/	২	-	৩	=	১
=		=		=		=
৪	+	১	+	৫	=	১০

ছোটোদের আঁকা

ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন, ১০ম শ্রেণি, স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা

আয়ান হক ভূঁইয়া, ২য় শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

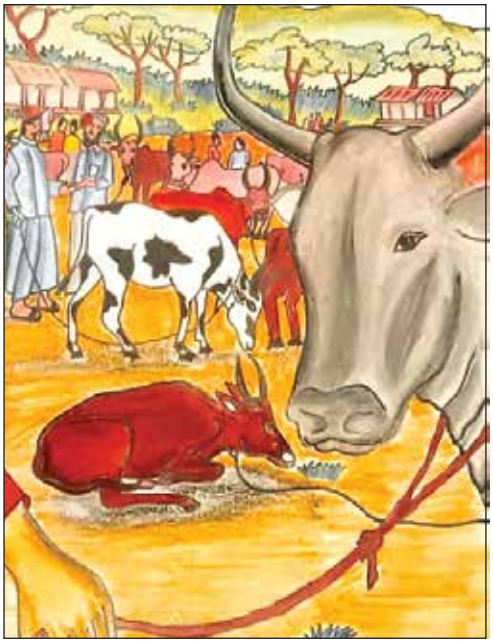

রাইসা ইন্তেসার ইমরান, ৯ম শ্রেণি
সরকারি বীণাপাণি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

সৈয়দ ফারহান নেয়ামুল জীম, ৯ম শ্রেণি, সানিডেইল স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-47, No-01, July 2022, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা